সেই সব শহীদেরা

পিনাকী বিশ্বাস

সেইসব শহীদেরা

সেইসব শহীদেরা

পিনাকী বিশ্বাস

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৪
প্রথম কাউন্টার এরা সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০২২

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

© পিনাকী বিশ্বাস

প্রচ্ছদ ঃ পার্থ সাহা

মুদ্রণ ঃ জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১/বি, বৈঠকখানা রোড, আমহার্স্ট স্ট্রিট,
মেছুয়া বাজার, কোলকাতা–৭০০ ০০৯

ISBN ঃ 978-81-928741-0-4

Counter Era-এর পক্ষে ২/২বি নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রিট,
কোলকাতা – ৭০০০০৯ থেকে রক্তিম ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত।

Seisob Shoheedera
by
Pinaki Biswas

Published by Counter Era
2/2 B Nabin Kundu Lane, College Row, College Street,
kolkata — 700009.

দাম ঃ ১২০ টাকা

উৎসর্গ

সেই সমস্ত শহীদদের যাঁদের ইতিহাসে নাম নেই
অথচ
যারাই ইতিহাস সৃষ্টি করেন...

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ৯

" ...হিমালয়ের চাইতেও ভারী" ১৫

একটি শহীদ ও কয়েকটি ক্লীব ১৯

সাম্প্রদায়িক তিতুমীর! মিথ্যাচারের উৎস সন্ধানে ২৪

রাসমণি থেকে অনুরাধা সংগ্রাম সতত প্রবহমান ৩২

সন্ত্রাস, নৈরাজ্যবাদ ও মার্কসবাদী উত্তরণ
–প্রসঙ্গ ভগৎ সিং ৪১

শতবর্ষের শ্রধাঞ্জলিঃ ডাঃ কোটনিস ৫৮

ভালোবাসার মানুষ- মুরারি ৬২

আগুনের কবি অতো রেনে কাস্তাইয়ো ৬৫

আফগান নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্নিশিখা
মীনা কেশওয়ার কামাল ৬৯

এক বিস্মৃত বিপ্লবী ৭৩

প্রমিথিউসের পথে ডাঃ দাভলকর ৮০

শহীদ বিষ্টু ঠাকুর : এক দুরন্ত অগ্নিঝড় ৮৫

আজি হতে শতবর্ষ আগে..... ৯২

মহম্মদ সিং আজাদের বিচার ৯৬

মুখবন্ধ...

শহীদের কথা

সব্যসাচী দেব

ইতিহাস এক নিষ্ঠুর নির্বাচক; অসংখ্য ছড়ানো উপাদান থেকে সে শুধু বেছে নেয় পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত মুখগুলিই, বাইরে পড়ে থাকে নাম-না-জানা কত না চরিত্র, ব্যক্তির স্মৃতিতে কিছুদিনের জন্য তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। তারপর স্মৃতি ধূসর থেকে ধূসরতর হতে থাকে, মলিন থেকে মলিনতর হতে থাকে তাদের ঔজ্জ্বল্য, তবু ইতিহাসের এই বর্জনকে এড়ানো যায় না। ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-চর্চায় জনগণ একেবারেই গৌণ, মার্ক্সবাদী ও সাব-অল্টার্ন ইতিহাসবিদ্‌রাই মনে করিয়ে দিয়েছেন তাদের ভূমিকা। কিন্তু ইতিহাস যত বড়ো ক্যানভাসই ব্যবহার করুক না কেন, প্যানারোমার বিস্তৃতিতে সমষ্টির চেহারা ধরা যেতে পারে, ব্যক্তির অবদানকে আলাদা করে চিহ্নিত করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। প্রশ্ন উঠতে পারে ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন আছে কী আদৌ!

সে এক কূটতর্ক। কিন্তু এও তো মানতে হয় যে ইতিহাস যাঁকে স্মরণীয় করে তোলে সেই মুহূর্ত থেকে তিনি পরিণত হন এক আইডলে, এবং আইডল মাত্রেই শ্রদ্ধাভাজন ও অভিনন্দনীয়, কিন্তু কিছুটা মাপে বড়ো, ইংরেজিতে যাকে বলা যায় 'লার্জার দ্যান লাইফ'। এই মাপ আদর্শবাদের প্রতিমূর্তি হতে পারেন, কিন্তু কিছুটা দূরবর্তীও তো। লেনিন বা মাও-সে-তুং বরণীয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে চেনাজানা তাদের কর্মে, তাদের লেখায়। তাদের আদর্শ অনুসারে জীবনকে গড়ে নেওয়া যায়, কিন্তু কী করে সেই আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে তা বুঝতে গেলে দরকার হয় এমন মানুষদের জানা যারা অনেকটা কাছাকাছি, যাদের জীবন থেকে বুঝে নেওয়া যায় কীভাবে বরণীয়দের পথে চলতে হয়। এ ধরনের মানুষ অজস্র, নিজেদের জীবনে

তারা দেখিয়ে গেছেন কীভাবে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, স্রোতের উল্টোদিকে কীভাবে সাঁতার দিতে হয়।

শহীদ কে! ব্যক্তিস্বার্থকে অগ্রাহ্য করে যারা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সবরকম স্বাধীনতার জন্য, এক শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য, জনগণের কল্যাণের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, বিনিময়ে কোনো নিজস্ব লাভ বা খেতাব বা স্বীকৃতি কিছুই চাননি শহিদ তারাই। এখন নির্বিচার ব্যবহারে শব্দটির মর্যাদা ক্ষুন্ন করে ফেলা হচ্ছে। সংকীর্ণ আঞ্চলিক বা পাড়াগত স্বার্থে বহু ওয়াগন-ব্রেকার, গুণ্ডা-মাস্তানরা গাষ্ঠৈসংঘর্ষে কিংবা পুলিশের বা প্রতিপক্ষ গেলেও তাকে শহীদ বানিয়ে, পাড়ার লোকের কাছে চাঁদা আদায় করে গলিত, বেদি খাড়া করে কিছুদিন ফায়দা লোটার প্রথা বেশ কিছুদিন ধরেই চালু। কিন্তু অধুনা ক্ষেত্রে শহীদ তৈরির একটা রেওয়াজ হয়েছে। সৈন্যবাহিনীর জওয়ানরা কোনো সংঘর্ষে মারা গেলেও তাকে দেওয়া হচ্ছে শহীদের সম্মান। তাদের মৃত্যু তাদের পরিবারের কাছে দুঃখজনক হলেও তারা বেতনভোগী কর্মী হিসেবেই মৃত্যু বরণ করেন, এই পরিণতি তাদের চাকরিরই অঙ্গ। জনগণের জন্য নিঃস্বার্থ মৃত্যুবরণ নয় তাদের, বরং অনেক সময় জনগণের সংগ্রামের বিরোধিতা করতে গিয়েই মরতে হয়েছে তাদের। কেন তাদের শহীদ বলব আমরা। কাশ্মীরী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে দমিয়ে দিতে গিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের হাতে মৃত্যু ঘটেছে যে পেশাদার সৈনিকের বা মণিপুরে যে পেশা, নিয়ত বিশেষ আইনের সুবিধায় অত্যাচার-পীড়ন চালিয়ে গেছেন কোন যুক্তিতে তাকে মেনে নিতে হবে শহীদ বলে। এই সংকলন সেই ধারণার বিপরীতে গিয়েই প্রকৃত শহীদদের কথা বলতে চেয়েছে।

এই সংকলনকে পূর্ণাঙ্গ বলা যাবে না, কোনো সংকলনই পূর্ণাঙ্গ হয় না; এই জাতীয় সংকলন তো নয়ই। খুব বিরাট কিছু করে ফেলার অহংকার থেকেও তৈরি করা হয়নি সংকলনটি। কিন্তু এর পিছনে ছিল এক দায়িত্ববোধে আর উত্তরপ্রজন্মের কৃতজ্ঞতা। পূর্বপ্রজন্মের প্রবল আত্মত্যাগ ছাড়া পরবর্তী

প্রজন্মের চেতনা প্রস্ফুটিত হতে পারে না, এগিয়ে যাওয়ার দিশা পাওয়া যায় না। নিজেদের জীবন দিয়ে যে মানুষগুলি শিখিয়ে গেছেন বাঁচতে হলে সবার জন্য বাঁচতে হয় তারা এও তো শিখিয়ে গেছেন মরতে হলেও সবার জন্য মরাই শ্রেয়। সেই মানুষগুলির কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম। এ নয় যে এই সংকলন দিয়ে ঋণ শোধের করার কথা ভাবা হয়েছে। এই ঋণ অপরিশোধ্য, তাকে বহন করেই উত্তরপ্রজন্মকে পথ চলতে হবে। এখানে শুধু এটাই জানাতে চাওয়া হয়েছে তাদের আমরা ভুলিনি, ভুলতে চাই না।

কোনো আন্দোলন কোনো বিদ্রোহ কোনো বিপ্লবই ভোজসভা নয়, তা এক কঠোর রুক্ষ রূঢ় সংগ্রাম। সে-সংগ্রামে পরিচালকের ভূমিকায় থাকেন কয়েকজন, বাকি বিপুলসংখ্যক থাকেন সেনানীর ভূমিকায়। সেই সেনানীরাই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যান, সফলতা আসে তাদের হাত ধরেই, ব্যর্থতা এলেও তাদের শ্রম, কষ্ট এঁকে দিয়ে যায় পথরেখা,তারা যদি ভুল করেও থাকেন সে ভুল অন্যদের কাছে হয়ে ওঠে সতর্কবার্তা। এই যে মানুষগুলি, নিজেদের চারপাশে বা নিজের সঙ্গেও প্রবল লড়াই করে তারা এগিয়ে যান, কোনো ব্যক্তিগত সিদ্ধির জন্য নয়, এক উপলব্ধ বিশ্বাস, এক আদর্শের জন্য, শুধুই জনগণের জন্য। চারপাশে বেঁচে থাকার চেয়েও তাদের মৃত্যু অনেক বেশি ভরে থাকে জীবনের উত্তাপে। চারপাশে প্রতিদিন নিজেরটুকু গুছিয়ে নেওয়ার কিছুটা বাধ্য কিছুটা স্বার্থপর ইদুরদৌড়ের শেষে যে মৃত্যু, পালকের চেয়েও হালকা সেই মৃত্যুকে কেউ মনেও রাখে না। আর এই শহীদরা জীবন দিয়ে গেছেন অন্যদের জীবনকে সুখী করে তোলার ব্রত পালন করতে গিয়ে, আত্মহত্যার আবেগে নয়, আত্মত্যাগের দৃঢ় প্রত্যয়ে, তাদের মৃত্যু হিমালয়ের চেয়েও ভারি। তবু ইতিহাস তাঁদের সবাইকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারে না, বলতে পারে না তাঁদের সবার কথা। তাহলে কি তাঁরা থেকে যাবেন সমষ্টির অংশ হয়েই, হারিয়ে যাবেন ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে ধরা ভিড়ের ছবিতে। সেই বিস্মরণকে এড়ানোর জন্য তৈরি হয় অনেক স্মৃতিকথা, অনেক টুকরো টুকরো ব্যক্তিপরিচয়। একথা অস্বীকার করা যাবে না ব্যক্তি নয়, সমষ্টির লড়াই-ই তৈরি করে বিপ্লবের রূপরেখা, তবু এও তো সত্য যে ব্যক্তিকে

গেঁথে গেঁথেই গড়ে ওঠে সমষ্টি; তাই ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না। বিপ্লব জনগণের উৎসব, সেই উৎসবে তাঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতি উপেক্ষা করা সম্ভব নয় কিছুতেই।

এই সংকলন সে-রকমই কয়েকজন ব্যক্তির কথা। এমন ব্যক্তি যারা নিজের ব্যক্তিসত্তাকে বিলীন করে দিয়েছিলেন সমষ্টির মধ্যে, সমষ্টির মুক্তির জন্যই লড়াই করেছিলেন তারই অংশ হয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা করে না রেখে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন তাঁরা, তবু এক অপরিমেয় স্বাতন্ত্র্যে তাঁরা উজ্জ্বল। সেই উজ্জ্বলতা অন্যকেও দীপ্তি দেয়। তাঁদের লড়াই এক ধরনের নয়। এই সংকলনে যাদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা কেউ লড়াই করেছিলেন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, কেউ দেশীয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে, কেউ দেশী-বিদেশী পুঁজির আক্রমণের বিরুদ্ধে, আর কেউ বা যে-কোনো ধরনের শোষণের মোক্ষম হাতিয়ার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। এঁরা কেউ মৃত্যুবরণ করেছেন রণাঙ্গনে, কেউ জেলখানায়, কেউ বা জনগণের সংগ্রামের সাথী হয়ে দুস্তর পথ পাড়ি দিতে গিয়ে নিজের কথা ভাবতে সময় পাননি বলে দুরারাগ্যে ব্যাধির কবলে পড়ে। তবু এক জায়গায় তাঁরা এক, তারা জনগণের পক্ষে, আর এই পক্ষাবলম্বন তাঁদের থাকতে দেয়নি কোনো নিশ্চিন্ত সুখী গৃহকোণে, টেনে এনেছে ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে। শেষ পর্যন্ত আরামের শয্যায় নয়, তাদের মৃত্যু হয়েছে ফাঁসির দড়িতে পুলিশ-মিলিটারি বা আততায়ীর বুলেটে অত্যাচারে চিকিৎসার অপ্রতুলতায়। কেউ মারা গেছেন ময়দানে, কেউ ধানক্ষেতে, কেউ শহরের ফুটপাথে, কেউ গোপন আস্তানায়, কেউ কারাগারে। তবু তারা সকলে মিলে রচনা করেছেন এক মহাকাব্য। এই সংকলন সেই মহাকাব্যটিকে ফিরে পড়ার এক সূচনাবিন্দু হয়ে উঠতে পারে।

এই সংকলনের সব লেখা এক ধরনের না। কোনো লেখা শুধু শহীদের পরিচয় ও কাজের বিবরণই আছে, আবার কোনো লেখায় আলোচ্য শহিদের কাজের সঙ্গে তাঁর মতাদর্শের বিশেষণও আছে। মনাযোগী পাঠক অনুযোগ করতে পারেন অনেকর কথা আসেনি বলে, সে-অপূর্ণতার কথা মেনে নিতেই

হচ্ছে। যদিও তার অনেক কারণই আছে। তবু কিছু কথা বলতে পারা গেল, আপাতত সেইটুকুও কম নয়, হয়ত আরও বিস্তৃত পরিসরে যোগ্য প্রয়াসে যোগ্যতর কোনো সংকলন কোনোদিন নির্মিত হবে, সেই আশা নিয়েই পাঠকের সামনে তুলে ধরা হলো এই সংকলনটি। স্মৃতিচারণার বেদনাবিলাস নয়, নিজেদের যাচাই করে নেওয়ার জন্য।

“.....হিমালয়ের চাইতেও ভারী”

লালগড় তথা জঙ্গলমহলে ধূমায়িত অসন্তোষ যখন ধীরে ধীরে গণ আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে, সেই প্রথম পর্বে সবার অলক্ষ্যে পার হয়ে গেল নীল বিদ্রোহের অবিসংবাদিত নেতা বিশ্বনাথ সর্দারের মৃত্যুর দ্বিশতবার্ষিকী। অবহেলিত শ্রমিক কৃষকদের বিদ্রোহ বা তথাকথিত পিছড়েবর্গ মানুষের লড়াইকে চাটুকার ঐতিহাসিকরা বিশেষ গুরুত্ব না দিলেও আন্দোলন কখনোই তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় না। তাই বর্তমান বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশ্বনাথ সর্দারের নাম অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আজকে যেভাবে বাংলার মানুষ ক্রমাগত বঞ্চনা আর জুলুমবাজির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তেমনভাবেই ঠিক ২০০ বছর আগে নীলবিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিলেন নদীয়ার এক সাধারণ কৃষক বিশ্বনাথ। ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে নীলবিদ্রোহ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কারণ আর পাঁচটা গণ অভ্যুত্থানের চেয়ে নীল বিদ্রোহ আলাদা। বিদ্রোহ হয়েই থেকে যায়নি, অনেকাংশে সফল হয়ে বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়েছিল।

এই আন্দোলন ছিল ইংরেজ সরকার, নীলকর ও দেশীয় জমিদারদের সম্মিলিত শোষণের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম, যার পথিকৃৎ ও প্রথম শহীদ বিশ্বনাথ সর্দার।

ব্রিটিশ সরকার ও তাদের তৎকালীন তাঁবেদার বুদ্ধিজীবীরা সেদিন কলম ধরেছিলেন নীলকরদের পক্ষে, বিদ্রোহীদের হেয় করার পাশাপাশি সরকারের প্রশস্তি রচনায় রত হয়েছিলেন তাঁরা। শতাব্দী পার হয়ে গেছে। শাসকের চরিত্র যেমন বদলায়নি তেমনি আজো সরকারী বেতনভুক, উচ্ছিষ্টভোগী বুদ্ধিজীবীমহল নির্লজ্জভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধিতা করে চলেছেন। আজকের শাসকবর্গও শঙ্কিত, বামপন্থার মুখোশের আড়ালে, উন্নয়নের নামে জল, জঙ্গল, জমি থেকে মানুষের অধিকারকে হরণ করতে ফ্যাসিবাদী কায়দায় দমনপীড়ন নামিয়ে আনছে প্রতিনিয়ত। আজকের মতোই সেদিন অবর্ণনীয় অত্যাচার, নিরবিচ্ছিন্ন শোষণের প্রতিবাদে বাংলার কৃষক মহাপরাক্রান্ত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পিছপা হয়নি। লড়েছে, মরেছে, পাল্টা মার দিয়েছে।

বাংলায় বেশ কয়েকটি পর্যায়ে নীলবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ১৭৭৮-১৮০০, পরবর্তীতে ১৮৩০-৪৮ এবং ৫৭-এর মহাবিদ্রোহের পরে বিভিন্ন অঞ্চলে। বিশ্বনাথ ছিলেন একদম প্রথম পর্বের নেতা। তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা ও সাহসের ফলে নদীয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন গণবিদ্রোহের আকার নেয়। প্রথমেই শান্তিপুরের তাঁত শ্রমিকদের উপর নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেন বিশ্বনাথ। তাঁর একের পর এক সুসংগঠিত আক্রমণে ধুলিস্মাৎ হয়ে যায় অত্যাচারের প্রাণকেন্দ্র খালবোয়ালিয়া, নিশ্চিন্দিপুর, বাঁশবেড়িয়ার নীলকুঠিগুলি। নায়েব, গোমস্তা মুৎসুদ্দিদের ঝাড়ে বংশে উৎখাত করে বিদ্রোহীরা সন্ত্রস্ত করে তোলেন শাসকবর্গকে। উপর্যুপরি রাজনৈতিক ডাকাতির ফলে নীলচাষ প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। নদীয়া ইন্ডিগো কনসার্নের মাথা স্যামুয়েল ফেডী নামক এক নীলকরের জুলুমে অতিষ্ঠ মানুষেরা বিশ্বনাথের নেতৃত্বে ১৮০৮

সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রে তাঁর কুঠী আক্রমণ করে। ফেডী ও এক ইউরোপিয়ান যাজক মিঃ লিডিয়ার্ডকে বন্দী করে সারা বাড়ি লুঠ হয়। ফেডীকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন গ্রামবাসীরা কিন্তু বিশ্বনাথের দয়ায় সে প্রাণভিক্ষা চেয়ে মুক্তি পায়। এর কয়েকমাস বাদেই ফেডী, ইংরেজ সেনাপতি ব্ল্যাক ওয়ারের সেনাবাহিনীর সাহায্যে ও নদীয়ার জেলাশাসক ইলিয়টকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বনাথকে ঘেরাও করে ফুলিয়ার জঙ্গলে। সাথীদের প্রাণ রক্ষার্থে দলনেতা বিশ্বনাথ সংঘর্ষ এড়িয়ে যান ও গ্রেপ্তার বরণ করেন। বিচারের প্রহসন শেষ করতে সরকার বেশি দেরী করেনি। তাঁকে ফাঁসী দেওয়ার পর 'সুসভ্য' ইংরেজ সরকার ঘৃণ্যতম মানসিকতার পরিচয় দেয়। এই মহাবিপ্লবীর মৃতদেহটি লোহার খাঁচায় পুরে আসাননগরের একটি গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয় ও চিল, শকুন দিয়ে খাওয়ানো হয়। ভীত শাসকরা চেয়েছিল বিদ্রোহীর পরিণতি প্রত্যক্ষ করে বাকি কৃষকরাও শঙ্কিত হোক। বিশ্বনাথের মা, পুত্রের কঙ্কালটি জলে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেনি। অধুনা আসাননগর গ্রামের সেই মাঠটি ফাঁসিতলার মাঠ বলে খ্যাত।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন "অসহায় জনগণের, কৃষকের সম্মুখে দন্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে অভয় ও বাঁচিবার জন্য সংগ্রামের প্রেরণাদানের উদ্দেশ্যে যাহারা একক শক্তিতে বিদেশী নীলকর দস্যুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পতাকা উড্ডীন করিয়ছিলেন, তাহাদের মধ্যে বিশ্বনাথ সর্দার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী।"

শহীদ বিশ্বনাথের জীবনীকার বিমলেন্দু কয়াল চমৎকার বলেছেন "শেরউড বনভূমির দস্যু রবিনহুড যে ইংরেজদের জাতীয় জীবনে মহিমায় মহিমান্বিত হইয়াছেন, সেই ইংরেজ ব্রাহ্মণীতলার বনভূমির বাঙ্গালী বীরকে দস্যু আখ্যায় আখ্যাত করিয়া হীনভাবে হত্যা করিয়াছে।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শিশুসাহিত্যিক ধীরেন্দ্রলাল ধর তাঁর "নীলকর এলো দেশে উপন্যাসে বিশ্বনাথকে পূজারী ব্রাহ্মণ হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন, বাস্তবে তিনি ছিলেন কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত।

চিরকালই সমস্ত জঙ্গী কৃষক আন্দোলন ও তার মহান নেতৃবর্গকে সন্ত্রাসবাদী ডাকাত, লুঠেরা বলে অভিহিত করা হয়েছে। আজো 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে'। শাসকশ্রেণীর রচিত ইতিহাসে বীর বিশ্বনাথ হয়ে গেছেন বিশে ডাকাত। তাদের অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগ স্বর্ণাক্ষরে তো দূরের কথা ছাপার অক্ষরেও ভালোভাবে লেখা নেই। যেমন লেখা নেই সন্ন্যাসী, চাকমা, চুয়াড়, গারো বিদ্রোহীদের দুরন্ত লড়াই-এর ইতিবৃত্ত।

না, বিদ্রোহী বিশ্বনাথকে আমরা সত্যিই ভুলেছি। তাঁর শাহাদতকে ইতিহাস মর্যাদা দেয়নি, তিনি বাস্তবিকই মুছে গেছেন ইতিহাস থেকে। তাই অতিনাটকীয় ভাবে একথা বলে এই লেখা শেষ করা যাচ্ছে না যে "শহীদ বিশ্বনাথের মৃত্যু নেই"। তবে বারবার ব্যবহারেও ক্লীশে না হয়ে যাওয়া একটি শব্দ আছে না?

"কোনো কোনো মৃত্যুর ওজন..."

(নারীমুক্তি, ২০০৯)

একটি শহীদ ও কয়েকটি ক্লীব

সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরকাল রাজত্বে সিপিএম সরকার একটি অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। মানুষ অমানুষ, না-মানুষ নির্বিশেষে সবাইকে তারা করে তুলেছে বামপন্থী। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন লাল বাংলার ঘেয়ো কুকুর, কালো পাঁঠা, সাদা গরু এমনকি শেয়াল, শকুন ও কিছু কিছু ছুঁচোও ভীষণ পরিমাণে বামপন্থী। দোহাই, হাসবেন না, হাসির কথা হচ্ছে না, এটা আমার অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। এ মাটি প্রগতিশীলতার দুর্জয় ঘাঁটি, বিপ্লবের সূতিকাগৃহ। প্রতি মুহূর্তে বিপ্লব পয়দা হয় মোদের সুমহান বঙ্গভূমে। কখনো কফি হাউসের টেবিলে কখনো বা অরকুটের ফোরামে, তবে মাঝে মাঝে গর্ভপাতও হয়ে থাকে আর গর্ভস্রাবের সঙ্গে যে নোংরা আবর্জনা বেরিয়ে আসে বোঝা গেল কলকাতা বইমেলা চলাকালীন একটি ঘটনার পর। বামমার্গী প্রগতি, সংস্কৃতির মচ্ছোব বইমেলা–২০১০ অনেক ভজন কেত্তন করে সাঙ্গ হলো। খুবই দুঃখের কথা ময়দান নিয়ে পুরোনো

মড়াকান্না ও ন্যাকামিটা এবার দেখা যায়নি। আসলে ঝানু ব্যবসায়ী ও খাবার দোকানীরা বুঝেছেন বিক্রিবাট্টা নতুন মাঠেও যথেষ্ট ভালো সুতরাং ওসব ছেঁদো নস্টালজিয়ায়, যাকে নিন্দুকেরা আদিখ্যেতা বলবেন তাতে আক্রান্ত না হলেও চলবে।

গত ২ রা ফেব্রুয়ারি রেজিস্টার্ড পত্রিকা বাংলা পিপলস্ মার্চের সম্পাদক, প্রকাশক স্বপন দাশগুপ্তের মৃত্যু ঘটল। প্রকৃতপক্ষে সুপরিকল্পিতভাবে তিলে তিলে তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। ভয়াবহ UAPA আইনের প্রথম শিকার তিনি। সম্ভবত ভারতে প্রথম। ৬ই অক্টোবর ২০০৯ তাঁকে Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), ধারা 18/20/39 এবং I.P.C. ধারা 121/121A/124A অনুযায়ী গ্রেপ্তার করে ২৮ দিন ধরে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালানো হয়। অ্যাজমার রুগি ও আগে থেকে অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও সরবরাহ করা হয়নি প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র এমনকি যথেষ্ট ওষুধ! জেলবন্দির মানবাধিকার লঙ্ঘনের জঘন্যতম দৃষ্টান্ত এই মৃত্যু। কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতায় গুরুতর অসুস্থ স্বপনবাবুকে জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত SSKM হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় যখন, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ওই দিনই বিকেলে বইমেলা লিটল ম্যাগাজিন চত্বর জুড়ে USDF নামক ছাত্রসংগঠনের কর্মীরা ধিক্কার কর্মসূচী গ্রহণ করে। বিভিন্ন স্তরের সচেতন মানুষ ও গণসংগঠনকে নিয়ে বের হয় প্রতিবাদ মিছিল। ঘটনাচক্রে লেখক অর্থাৎ এই অধম তখন সেখানে উপস্থিত ছিল, সূচনায় যে কথাগুলো লিখেছি তা আমার সেদিনের অভিজ্ঞতার মর্মান্তিক ফসল মাত্র। অনেক সাধারণ মানুষ যেমন যেচে গ্রহণ করেছেন কালো ব্যাজ তেমনি কিছু অতিবিপ্লবীর সাহসের নমুনা দেখে হতবাক হতে হয়েছে। নতুনরূপে জানলাম এসব প্রবলতম বিপ্লবীদের। ভ্যারাইটি আছে বটে। হিসেব করে পা ফেলতে হয় তাদের। সিপিএম হারার আনন্দে দুটো বিড়ি বেশি খেয়ে ফেলেন তবে উদ্বাহু হন না কারণ তৃণমূল জিতেছে। ইরাক, আফগানিস্থান, নিকারাগুয়ায় মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সই সংগ্রহ হয়। সাম্রাজ্যবাদের গুষ্টির তুষ্টি করেন অথচ কাশ্মীর প্রসঙ্গ এলেই কেমন যেন এলিয়ে পড়েন। কেউবা এককালে

কাঁচা আগুন (নাকি বেগুন!) কচ্ মচ্ করে চিবিয়ে খেয়েছেন এখন উঞ্ছবৃত্তি করে পেট চালান। মহাভারত হয়ে যাবে তাই মাত্র দুটো উদাহরণ রাখবো এবং সেই সমস্ত অমেরুদন্ডীদের ছুঁড়ে দেওয়া প্রশ্নের জবাব দিয়ে ইতি টানবো এই বিরক্তিকর রচনার।

নয়া গণতন্ত্রের পূজারী একদল আছেন যারা চারু মজুমদারের ছবিতে ফুলমালা টাঙিয়ে বই বিক্রি করেন। জানিনা অঞ্জলি দেন কিনা। আপনারা বলতে পারবেন? নানা ধরনের বৈপ্লবিক বইপত্র বিক্রিবাটা হয়। এঁরা তো কালো ব্যাজ দেখেই চমকে গেলেন। "কে স্বপন? অঃ বিনা চিকিৎসায়, রিয়েলি? ওক্কে। রেখে যান"। রেখে এলাম এই ভরসা থেকে হয়তো পরবেন কোনো একসময়। কোনো একদিন হয়তো বা ওদের অবকাশ হবে ধিক্কার জানাবার। ঢুকলাম এবার বিজ্ঞানমনস্কের দরবারে। এরা হেতুপন্থী। সবকিছুর পশ্চাতে হেতু অন্বেষণ যাদের প্রধান কাজ। দোষটা আমাদেরই কেন যে 'অহেতুক' এসব কর্মসূচীটুচী করে থাকি! ব্যাপারটা ক্লিয়ার করতে বাছা বাছা কিছু প্রশ্ন এলো। যথারীতি "কে স্বপন? কিভাবে জানা গেল এটা হত্যা? কেনই বা বিশ্বাস করব?" পরিশেষে "যাকে চিনিনা তার জন্য এসব পরবো কেন?" লে ঠেলা, ঘাবড়ে গিয়েও কিছু বলার চেষ্টা করেছিল অনেকে। কেউ বা বিরক্ত, বিব্রত। আমি সেদিন ছিলাম নীরব দর্শক, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে উত্তর দেওয়া জরুরী বলে মনে করি। যাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না তার জন্য কালো ব্যাজ পরা যায় কি? যায় যায়, Zনতি পারোনা। হে হেতুবাদীর দল সোমালিয়া, জিম্বাবোয়ের অপুষ্ট, অনাহারক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ শিশুদের জন্য যখন বেদনায় উদ্বেল হও, গুজরাট গণহত্যায় মৃত মানুষদের লাগি তোমাদের কুম্ভীরাশ্রু যখন শতধারায় বয়ে যায় তখন কি জোর করে বিশ্বাস করাতে হয় এগুলি হত্যা ছিল? ইজরায়েলী হানায় নিহত, গৃহহারা অসংখ্য নিষ্পাপ শিশুদের ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়ই চেনো না। তবে?

বাপু হে, আমরা জানি রাষ্ট্রের বুলেট যে কলমের দিকে ধেয়ে আসেনা, সে কলম বিক্রি হয়ে গেছে। এখানে ঝুঁকির গন্ধ আছে। এও জানি ঝুঁকির

দিকটি সযত্নে এড়িয়ে, ধরপাকড়ের মাহেন্দ্রক্ষণে ভেগে পড়েই তোমরা বিপ্লবী হয়েছ। নইলে যে শাসকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ঠিকাদারী পাওয়া যায় না।

কিন্তু কে এই মানুষটি; কে স্বপন দাশগুপ্ত, যার জন্য আমাদের শোকগ্রস্ত হতে হবে? সত্যিই তো, ইনি এমন কোনো মহান কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন না যাঁর মৃত্যুতে লক্ষ টাকার ফুল, আলো, গ্রোসাইন-বোর্ড সহযোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হবে। হবে ব্যয়বহুল পারলৌকিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, শোকবার্তা আসবে দেশ-বিদেশ থেকে, নিদেনপক্ষে 'চব্বিশঘণ্টা' চ্যানেলে চ্যানেলে বেজে যাবে ইন্টারন্যাশনাল।

স্বাধীনতা সংগ্রামী শিশির কুমার দাশগুপ্ত ও মনিকা দাশগুপ্তের সন্তান স্বপন দাশগুপ্তের জন্ম ১৯৪৯ সালের ১৯শে এপ্রিল দিল্লিতে। পিতা ছিলেন অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত। স্বপন দাশগুপ্তর পথচলা শুরু ৬৬-র বিখ্যাত খাদ্য আন্দোলন থেকে, তরুণ বয়সে নকশালবাড়ির দুরন্ত আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে গ্রেপ্তার হন। প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। CPI(ML) গোষ্ঠী ভাঙনের পর ১৯৭৩ সালে যোগ দেন মহেন্দ্র সিং গোষ্ঠীর সাথে। চিনতে পারছেননা বুঝি? আচ্ছা আপনারা তো আশুতোষ মজুমদারকে চেনেন। যাদবপুরের সেই মেধাবী ছাত্রটি যে কিনা কবিতা লিখত, যে কিনা বন্ধুদের বাঁচাতে বুক পেতে দেয় মিলিটারীর উদ্যত রাইফেলের সামনে। ১৯৭১-র ১০ই মার্চ আশু শহীদ হন। অ্যাই! চিনেছেন তো। স্বপন দাশগুপ্ত ছিলেন সেই দ্রোহকালের উজ্জ্বল তরুণ আশুর অভিন্নহৃদয় সাথী। প্রথমদিকে ১৯৭২ সালে জয়েন করেন Central Exise এ উড়িষ্যায়, '৭৪-এ সব ছেড়ে আত্মনিয়োগ বিপ্লবী রাজনীতিতে। '৮০ সালে পিতার মৃত্যুর পর জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত অকৃতদার মানুষটির উপর অনেক দায়িত্ব এসে পড়ে। কোর্ট টাইপিস্ট থেকে বোম্বে ডাইং-এর স্টেনো এমন অজস্র কাজ তিনি করেছেন তবু আপোষের পথে কখনো হাঁটেননি। বরাবর যুক্ত থেকেছেন বামপন্থী বিভিন্ন গণসংগঠনের সাথে। বন্দীমুক্তি আন্দোলন থেকে শুরু করে টালিনালা বস্তি উচ্ছেদ বিরোধী সংগ্রামে তিনি ছিলেন প্রথম সারির কর্মী

অথচ প্রচারবিমুখ। ২০০৪ সালে আবার গ্রেপ্তার হন। বহু প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও নিয়মিতভাবে তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়েছে বাংলা পিপলস্ মার্চ, চালিয়ে গেছেন সম্পাদনার কাজ, র‍্যাডিকাল প্রকাশনী একা হাতে। কালা আইনের গিলোটিনে মাথা রেখেও কলম ছাড়েননি।

তবু কমরেড দাশগুপ্ত তো কোনো চে'গুয়েভারা নন যে তাঁর মৃত্যু সখের বিপ্লবীদের অপরাধী করে দেবে। তথাকথিত ভদ্রজনমন্ডলী বা কোনো ভাঁড় কবিও "অনবরত দেরী হয়ে যাচ্ছে" বলে কেঁউ কেঁউ করবেন না। নাহ্, তাঁর এবং তাঁর মতো অসংখ্য শহীদের বীরগাথা রচনা করবে না ভাড়াটে কলমবাগীশ বা আত্মরতিসর্বস্ব ক্লীবের দল।

কিন্তু–

শ্রমিকের কলে, খনিতে, কারখানায়, মাঠে, ময়দানে, কামারশালায়, কৃষকদের পর্ণকুটীরে, অখ্যাত চারণকবির কণ্ঠে আপনা আপনিই তাদের চিন্তা-চেতনা গান হয়ে ছড়িয়ে পড়বে মুক্তিকামী মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। বিছন হয়ে ভেসে যাবে পাখির মুখে মুখে, দেশ হতে দেশান্তরে।

"মানুষের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো জীবন।
সে জীবনও সে পায় মাত্র একবার, কাজেই সে
তার জীবন এমনিভাবে ব্যয় করবে যেন মরবার
সময় সে বলতে পারে আমার সমস্ত শক্তিসামর্থ্য
পৃথিবীর মহত্তম কাজের জন্য দান করেছি।
সে কাজ–মানব সমাজের মুক্তি"

(ইস্পাত : নিকোলাই অস্ত্রোভস্কি)

মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী, কে তাকে আটকাবে। তবে তার তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন। ঠিক এমন মৃত্যুর ওজনই হিমালয় পর্বতকে চ্যালেঞ্জ জানায়। হুঙ্কার দিয়ে বলে "তফাতে থাক্"।

এই মুহূর্তে, আগস্ট-২০১০

সাম্প্রদায়িক তিতুমীর! মিথ্যাচারের উৎস সন্ধানে

মিথ্যাচার যদি নির্জলা হয় তবে ধরা পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা; একথা সবচেয়ে ভালো জানতেন খুব সম্ভব গোয়েবলস। অর্ধসত্য, যা কিনা সময় বিশেষ মিথ্যের চাইতেও ভয়ানক এমন জিনিস প্রচার করেই তিনি ইতিহাসে কুখ্যাত, আর তাঁর বরপুত্রেরা যুগে যুগে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইতিহাস রচনা করেছেন, তাঁদের লেখায় অবহেলিত হয়েছে দেশের জনগণের সংগ্রামের ইতিহাস, বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে, ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে শোষকের বিরুদ্ধে জীবনপণ করে লড়া মানুষের কথা। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে গো-বলয় গঠন করার কাজে ব্যপ্ত গোমাতার সন্তানেরা যখন ইতিহাস বিকৃত করে, চে'র গেঞ্জিপরা উজ্জ্বল তরুণ, শহীদ ক্ষুদিরামকে 'বাড় খাওয়া' সন্ত্রাসবাদী হিসাবে অভিহিত করে অথবা বাজারী ঐতিহাসিকের বইতে মঙ্গল পান্ডে হয়ে যান সামান্য নেশাখোর তখন ইতিহাস একইভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়। শুরুটা করে গেছিল সাম্রাজ্যবাদীদের চাটুকার ঐতিহাসিকেরা।

সেই ধারা সতত প্রবহমান এবং তার প্রধান লক্ষ্যবস্তু শ্রমিক কৃষকের নেতৃত্বে যাবতীয় গণ-আন্দোলন। অগ্নিযুগের বিপ্লবী হয়ে গেছেন 'সন্ত্রাসবাদী ডাকাত' আর কৃষক বিদ্রোহীরা 'দাঙ্গাবাজ লুঠেরা'!

এমনই এক অভিযোগ আনা হয় ওয়াহাবী আন্দোলনকারী মীর নিসার আলি ওরফে তিতুমীরের বিরুদ্ধে। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, তিতুমীরের আন্দোলন প্রাথমিক পর্বে ইসলাম ধর্মের সংস্কার ও মুসলিমদের উন্নতি সাধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যদিও এসব করতে গিয়ে তাঁকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে তথাকথিত 'জেহাদ' ঘোষণা করতে হয়নি, উপরন্তু তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। কুমুদ নাথ মল্লিক তাঁর 'নদীয়া কাহিনী' শীর্ষক গ্রন্থে আন্দোলনকে 'ধর্মোন্মাদ মুসলমানের কাণ্ড' বলেছেন। সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকায় তিতুর বিদ্রোহকে হিন্দু বিরোধী মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা হয়েছে। ঐতিহাসিক বিহারীলাল সরকার ইংরেজ প্রশস্তি করে লিখেছেন 'তিতু বড়ই দুর্বুদ্ধি তাই তিতু বুঝিল না ইংরেজ কত ক্ষমাশীল, কত করুণাময়।" তাঁর ভাষায় বারাসাত বিদ্রোহ হিন্দু বিদ্বেষী একটি আন্দোলন মাত্র। বিহারীলালের ইংরেজ প্রীতি সর্বজনবিদিত সুতরাং এসবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই কিন্তু বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতো চিন্তাবিদও যখন একই বক্তব্য পেশ করেন তখন তা নিঃসন্দেহে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যে শাসনব্যবস্থা মুখ্যত অবিচার আর শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে শ্রমজীবী মানুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে খুনী রাষ্ট্রকাঠামোকে উৎখাত করতে উদ্যত হয়েছে, পরাজয় নিশ্চিত জেনেও লড়েছে এর সত্যতা যুগে যুগে প্রমাণিত। ভারতের ওয়াহাবী আন্দোলনও এর ব্যতিক্রম নয়। W. Cantwell Smith ওয়াহাবী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন মুসলিম পরিচালিত এই আন্দোলন ছিল হিন্দুদের সমর্থনপুষ্ট এবং কিছু সামন্তরাজা ও ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল এর পিছনে। দূরদর্শী তিতুমীর উপলব্ধি করেন নিরন্ন, অশিক্ষিত মানুষকে প্রথম অবস্থায় একজোট করতে হলে ধর্মীয় দিশা দেখাতেই হবে, সেভাবেই তাঁর সংগ্রামে ধর্মীয় ধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছিল বটে তবে তা সাম্প্রদায়িক হয়ে দাঁড়ায়নি।

পুঁজিবাদী শিল্পবিকাশের পূর্বে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই একমাত্র ধর্মীয় ধ্বনির মাধ্যমেই জনসমাবেশ গড়ে তোলা সহজ ছিল। জার্মানীতে কৃষক বিদ্রোহের নেতা মুয়েঙ্গার বা সাঁওতাল বিদ্রোহে সিধু-কানহু একইভাবে শোষিত জনগণকে একত্রিত করেছিলেন। মহাবিদ্রোহের অগ্নিস্ফূলিঙ্গ জ্বলে ওঠার কারণটি হয়তো ধর্মীয় কিন্তু যখন তা দাবানল আকারে ছড়িয়ে পড়ে তখন পুরোপুরি রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহণ করে। মুক্তমনের বিচারে ধর্মীয় স্লোগানের বিষয়টি রণকৌশলের অঙ্গ হিসাবেই দেখা যেতে পারে।

স্বদেশী চাটুকারেরা স্বীকার না করলেও Smith তাঁর Modern Islam in India গ্রন্থে ব্যাপারটাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শ্রেণীসংগ্রাম হিসাবেই দেখিয়েছেন।

"The Struggle was a pure class struggle and the communalist confusion of the issue evaporated. The movement made use of a religion's ideology, as class struggle in pre-industrialistic society have often done, but though religious it was not communalist" [page-189]

আসলে অত্যাচারী জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বিরুদ্ধে তিতুমীরের কড়া অবস্থান অভিযোগকারীদের হাতিয়ার হয়ে গিয়েছে। আন্দোলনের ব্যপকতা থেকে বোঝা যায় শুধু একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ভাবাবেগ সঙ্গী করে এতবড় বিদ্রোহ সংঘটিত করা অসম্ভব। এসময় তিনি কিছু হিন্দু জমিদারের সহানুভূতি পেয়েছিলেন। ভূষণার জমিদার মনোহর রায় তিতুমীরের পক্ষাবলম্বন করে কৃষ্ণদেবকে পত্র দেন ও তাঁকে নীলকরদের সাথে হাত মিলিয়ে তিতুমীর অনুগামীদের ওপর অর্থনৈতিক কর বসানো থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানান। হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াইকে যারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়াই বলে চালাতে চান, তাদের জানা উচিত তৎকালীন ভারতবর্ষের মতো সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত দেশে মানুষের ধর্মও শোষকশ্রেণীর শিকার হয় এবং জনগণের সংগ্রাম ধর্মীয় বা অন্য যে কোনো কারণেই শুরু হোক না কেন পরবর্তীতে রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়।

হতে বাধ্য। উল্লেখযোগ্য হল, রমেশচন্দ্র মজুমদার মশাই কিন্তু সমালোচনার পাশাপাশি তিতু পরিচালিত বিদ্রোহকে দেশীয় সামন্ত ও নীলকর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটি কৃষক আন্দোলন হিসাবে দেখেছেন। একই সঙ্গে W.W. Hunter তাঁর The Indian Musalmans গ্রন্থে ধর্মীয় বিষয়ে ওয়াহাবীদের সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের 'অ্যানাব্যাপটিস্ট' এবং রাজনৈতিক বিষয়ে কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী সাধারণতন্ত্রীদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যদি আন্দোলনের অভিমুখ শুধু হিন্দু বিদ্বেষী হতো তবে ধুরন্ধর ইংরেজ সরকার তাতে অতি সহজেই সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকিয়ে ধ্বংস করে দিত, বাঁশের কেল্লা ওড়াতে কামান দাগতে হতো না! ধর্মসংস্কারের দিকটি দেখলে বোঝা যাবে তিতুমীর ছিলেন সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা হলেও এগিয়ে থাকা মানুষ যিনি সাহসের সঙ্গে কুসংস্কারের বিরোধীতা করেন। ওয়াহাবী আন্দোলনের কুশীলব সৈয়দ আহমেদের (১৭৮৬-১৮৩১) সাথে দ্বিতীয় সাক্ষাতের পর সংগঠন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি যে প্রচারকার্য চালান তার মধ্যে ছিল "পীর পয়গম্বর মানিতে নাই, শ্রাদ্ধ শান্তির প্রয়োজন নাই, মন্দির মসজিদ তৈয়ার করিতে নাই, সুদ লইতে নাই" ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবে এতে মোল্লা ও ধনী মুসলমানের ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ধর্মভেদে শাসক কিংবা দালালের চরিত্রগত হেরফের হয় না, তারা সমবেতভাবে তিতুর বিরোধীতায় নেমে পড়ে। এবং উভয় সম্প্রদায়ের জমিদারেরা তিতুকে পরাভূত করতে উদ্যোগী হয়। একাজে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে কৃষ্ণদেব রায়, কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, দেবনাথ রায় প্রমুখ। অপরপক্ষে তিতুর বক্তৃতা শোনার জন্য দলে দলে হিন্দু মুসলমান উপস্থিত হতো। ইসলামে পূর্ণ বিশ্বাস এবং হিন্দু কৃষকদিগকে সাথে নিয়ে ইংরেজ মদতপুষ্ট জমিদার ও নীলকর খতম ছিল বক্তৃতার মূল প্রতিপাদ্য।

যুদ্ধের চরিত্র ও পুরাতনপন্থী মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা প্রমাণ করে আন্দোলনের অভিমুখ হিন্দুবিদ্বেষী মনে হলেও তা ছিল সামন্তবিদ্বেষী। যেহেতু জমিদারদের বেশিরভাগই হিন্দু আর কৃষকদের বেশিরভাগ মুসলমান তাই 'অর্ধসত্যের ফেরীওয়ালারা' তথ্যের চাইতে অনুমানের ওপর বেশি নির্ভর করেন। অথচ এই বিহারীলালই লিখে গেছেন তিতু আপন ধর্মমত প্রচার

করেছিলেন। সে ধর্মমত প্রচারে পীড়ন তাড়ন ছিল না। লোকে তার বাগ-বিন্যাসে মুগ্ধ হয়ে, তাকে পরিত্রাতা মনে করে তার মতাবলম্বী হয়েছিল। তিতু প্রথম শোনিতের বিনিময়ে তার প্রচার করতে চায়নি। জমিদার কৃষ্ণদেবের জরিমানার ব্যবস্থা তার শান্ত প্রচারে হস্তক্ষেপ করলো। তারাগুনিয়ার জমিদার রামনারায়ণ, নগরপুরের গৌরপ্রসাদ চৌধুরী এবং কৃষ্ণদেব রায় তিতুমীরের প্রভাব ক্ষুন্ন করার অভিপ্রায়ে বিক্ষুব্ধ হানাফি মুসলমান কৃষকদেরও কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিল।

গৌতম ভদ্র অভিমত প্রকাশ করেছেন তিতুর মূল সামাজিক আবেদন ছিল গ্রামের নিম্নকোটির মানুষদের কাছে। যারা জাতিতে তারা যুগী, জোলা আর কৃষক। এদের অনেকেরই উপাধি ছিল কারিগর। এদের মধ্যে অনেকে তাঁত বুনতো আর নগণ্য রায়ত ছিল। মুসলমান সমাজে অন্ত্যজদের মধ্যে তিতুর প্রচার খুবই কার্যকর হয়েছিল। তিতুর নিজের সামাজিক মান মর্যাদা ছিল কিন্তু তার দলে সম্পন্ন লোকদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। কলভিন বলেছেন, যাদের কিছু হারাবার আছে তারা তিতুর দলে যোগ দিয়ে ঝুঁকি নিতে চায়নি। দুর্গাচরণ রক্ষিতের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় হিন্দুদের মধ্যে যুগীরা সে শ্রেণীস্থ মুসলমানদের মধ্যে জোলারাও সেই শ্রেণীস্থ। বস্ত্রায়ন তাদের প্রধান উপজীবীকা। তারা সকলেই নির্ধন। যুগী আর জোলাদের জল সাধারণে স্পর্শ করে না। এহেন লোকদের মধ্যে তিতু দল গড়েছিলেন। সুতরাং এই আন্দোলন কেবলমাত্র হিন্দুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল এ অতিশয়োক্তি।

যারা গো-হত্যা ইত্যাদির মতো দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনায় সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খুঁজে পান, ড ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বয়ান টেনে আনেন, তারা পুরোটা দেখছেন না বা দেখতে চাইছেন না। দত্ত লিখেছিলেন, জমিদারগণের শোষণ উৎপীড়নই তিতুমীরের 'শান্তিপূর্ণ ধর্মসংস্কার আন্দোলনকে' ব্যাপক বিদ্রোহে রূপান্তরিত করেছিল। লক্ষ্যণীয় হিন্দুদের পাশাপাশি তিতুর আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে অত্যাচারী মুসলিম জমিদারেরাও। এবং তা একটি নয়, একাধিক।

শোরপুরে ইয়ার মহম্মদ নামে ধনীর বাড়ি লুঠ, ১৮৩১ সালের ১৪ অক্টোবর খাসপুর, রামচন্দ্রপুর এলাকায় ধনী মুসলিম জোতদারদের বাড়িতে রাজনৈতিক ডাকাতিগুলি তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দেয়। তাঁর আক্রমণে বারাসাত অঞ্চলের বহু তালুকদার, মহাজন, ধনী মুসলমানরা ইতস্তত পলায়ন করে। পরে বিদ্রোহ দমিত হলে যে ফৌজদারী মামলা দায়ের হয়েছিল তাতে হিন্দু জমিদারদের সাথে মুসলিম জোতদার, মহাজনেরা সামিল হয়। উল্লেখযোগ্য যে, দাড়ির ওপর কর বসানো নিয়ে গ্রামীণ কবিয়ালরা গান রচনা করেন যেথায় তিতুমীরের কথা বারবার এসেছে, কখনো সমর্থনে, কখনো বিরোধীতায়।

"নামাজ পড়ে দিবারাতি
কি তোমার করিল খেতি
কেনে কল্লে দাড়ির জরিমানা।"

আবার নাপিত এ ঘটনায় তার মজুরী অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয় তখন–

"জোলানী উঠিয়া চলে উঠরে জোলা কাট।
হাজাম বাড়ি গিয়া শীঘ্র গোঁপদাড়ি কাট।।
তিতুমীরের গলা ধরি নাসিরদ্দি কয়..." ইত্যাদি।

বিরোধীতায় গান যেমন পাওয়া যায়–

"নারিকেলবেড়ের তিতুমীর বুজরুগি করিল
যতসব মিঞা মোল্লা
বনায়ে বাঁশের কেল্লা
ফিরিঙ্গী বাদসার সাথে লড়াই জুড়িল।"

শুধুমাত্র তাই নয়, আরবী নাম রাখার জন্য কর, মসজিদ নির্মাণে অতিরিক্ত কর এমনকি মসজিদে অগ্নিসংযোগের মতো ঘৃণ্য চক্রান্তে কৃষ্ণদেব যুক্ত হলে তিতু প্রতিশোধার্থে পুঁড়া গ্রাম আক্রমণ করেন ১৮৩০ সালের ৬ই নভেম্বর, ও তাঁর সাথীরা একটি গরু হত্যা করে। এই গোহত্যা ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের আঘাত করেছিল। তিতু কর্তৃক অত্যাচারী জমিদার দেবনাথ রায়

হত্যার কয়দিন পর নীলকর ডেভিস তিতুকে আক্রমণ করে ও পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। আত্মবিশ্বাসী হয়ে বারাসাত থেকে বসিরহাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় তিনি নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন। তার অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন মৈনুদ্দিন। ১৫ই নভেম্বর ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার যুদ্ধে পরাজিত হলে তিতু দ্বিগুণ উৎসাহে একের পর এক নীলকুঠি ধ্বংস করতে থাকেন। বারাসাত ও নদীয়ার বেশ কিছু এলাকায় নীলচাষ প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় এবং উল্লসিত প্রজাগণ নীল বুনতে অস্বীকার করে, খাজনা দেওয়াও বন্ধ করে দেয়। এমনকি জেলা কালেক্টার ও জমিদারগণের সম্মিলিত বাহিনীকে সেনাপতি মাসুম নাস্তানাবুদ করেন; তার কারণ ছিল জনসমর্থন। আতঙ্কিত ব্রিটিশরাজ তিতুকে বন্দী করতে নারকেলবেড়িয়ায় সেনা প্রেরণ করেন। এর পরের ঘটনা সবার জানা, ১৮৩১ এর ১৪ই নভেম্বর বাঁশের কেল্লা ইংরেজবাহিনীর হাতে ধুলিস্যাৎ হয়। তিতু কামানের গোলায় মারা যান, সেনাপতি গোলাম মাসুমের ফাঁসি হয়। দীর্ঘ বিচারে ৩৫০ জনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাবাস হয়েছিল।

ঐতিহাসিক নরহরি কবিরাজ বলেছেন এই আন্দোলনে ধর্ম বহিরঙ্গ মাত্র, রূপটা ধর্মের মূল বস্তু ও সার শ্রেণি সংঘর্ষ। ঐতিহাসিক প্রাবন্ধিক সুপ্রকাশ রায় 'বারাসাত বিদ্রোহের ঐতিহাসিক অবদান' শীর্ষক রচনায় সঠিকভাবেই বলেছেন "কামানের মুখে বিদ্রোহের নায়ক তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা শুষ্ক পত্রের মতো উড়িয়া গেলেও ইহা বংশ পরম্পরায় বাঙালী জনসাধারণের চিত্তভূমিতে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা সংগ্রামে যে অজেয় দুর্গ রচনা করিয়া রাখিয়াছে, ইংরেজ শাসকগণ সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াও কোনোদিন তাহার ভিত্তি টলাইতে পারে নাই।" এই আন্দোলনকে শ্রেণি সংগ্রামের আখ্যা না দেওয়া গেলেও তা যে ব্রিটিশ বিরোধী কৃষক আন্দোলন ছিল তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

বাস্তবিকই তিতুমীর ও তাঁর পূর্বসূরীদের সমস্ত আপাত ব্যর্থ কৃষক বিদ্রোহের ভস্মরাশি হতে জন্ম নিয়েছিল ১৮৫৭-এর জাতীয় মহাবিদ্রোহ যা

প্রবল প্রতাপান্বিত রাজশক্তিকে কাঁপিয়ে দেয়। পরিশেষে যে কথা না বললেই নয়, ঐতিহাসিকদের কাজ তাঁরা করেছেন এবং করছেন, কে শহীদদের মর্যাদা দিল, আর কেই বা অবজ্ঞা করল তাতে আজ তাঁদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু ভারতবর্ষের কৃষক সংগ্রামের অসংখ্য অনাম্নী শহীদের মাঝে তিতুমীর আছেন, প্রবলভাবেই আছেন, সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ মাথায় নিয়ে।

তথ্যসূত্রঃ

(১) ওয়াহাবী আন্দোলন : ইতিহাসের পুনর্বিচার–আমিনুল ইসলাম
(২) ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম–সুপ্রকাশ রায়
(৩) প্রসঙ্গ আন্দোলন : ফিরে দেখা–অশোক চট্টোপাধ্যায়
(৪) নীল বিদ্রোহ ও বিদ্রোহের সাহিত্য–শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়
(৫) নদীয়া কাহিনী–কুমুদ নাথ মল্লিক
(৬) বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ : অমলেন্দু দে

ঘুম নেই, অক্টোবর ২০১০

রাসমণি থেকে অনুরাধা সংগ্রাম সতত প্রবহমান

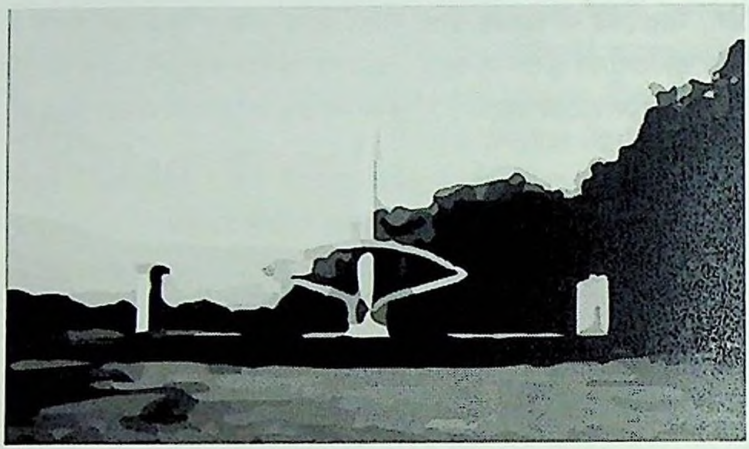

১৯৪৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী কিংবা ২০০৮ এর ১২ই এপ্রিল। মাঝখানে অনেকটা সময়, আপাতদৃষ্টিতে তারিখ দুটিতে কোনো মিলই নেই। প্রথম দিনটিতে শহীদ হয়েছিলেন হাজং বিদ্রোহের দুর্ধর্ষ নেত্রী আর দ্বিতীয়টিতে অন্তরীণ অবস্থায় দুরারোগ্য ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান অনুরাধা গান্ধী। সাদা চোখে দেখলে এই দুই নারীর মধ্যে মিলের চাইতে অমিলই বেশি। কৃষকনেত্রী রাসমণি মারা যান রণাঙ্গনে। শত্রুর বুলেট বিদীর্ণ করেছিল তাঁর শরীর। অনুরাধা সেই অর্থে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ না করলেও আজীবন বিপ্লবী কার্যকলাপে যুক্ত থাকার দরুণ সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে প্রায় চিকিৎসাহীন অবস্থায় মারা যান। তাঁর মৃত্যুকে অনায়াসেই শহীদের আত্মত্যাগের সমপর্যায়ে ফেলা যায়। অনুরাধা ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারিণী, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকপ্রাপ্তা বিপ্লবী নারী। অপরজন স্বল্প শিক্ষিতা গ্রাম্য রমণী হয়েও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন বাস্তব জীবনে। মাও এর চিন্তাকে প্রতিষ্ঠা দেন গেরিলা যুদ্ধের ময়দানে। একজন লড়েছিলেন বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে তো

অপরজনের নিরবিচ্ছিন্ন পথচলা দেশীয় শাসকদের বিরুদ্ধে। এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটা বিষয়ে তাঁদের দারুণভাবে মেলানো যায়। এরা দুজনেই মৃত্যুর আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত ব্যয় করেছিলেন নিপীড়িত শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে আর তাই বোধহয় দুটি নাম একসাথে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা সার্থক।

এবার সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক এই দুই মহান বিপ্লবীনীর জীবনকাহিনী–

রাসমণির কথা :

ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে গারো পাহাড়ের কোলে বাস হাজং উপজাতির। অর্থনৈতিকভাবে ভয়ঙ্কর পিছিয়ে পড়া এই গোষ্ঠীর জীবনে অভিশাপের মতো ছিল মধ্যযুগীয় ভূমিদাস প্রথা যার পোশাকী নাম টঙ্ক প্রথা। তোলা আদায়, বেগার খাটানো, নানা অর্থনৈতিক কর বসিয়ে সীমাহীনভাবে তাদের শোষণ করত স্থানীয় জমিদার ও মহাজনেরা। ১৯৩৭-৩৮ এর কৃষক বিদ্রোহের ঢেউয়ে প্রবাহিত হয়েছিল বহু হাজং চাষী। সেই শুরু। তারপর ১৯৪৬ সালে তেভাগার প্রাবল্যে উৎসাহিত হাজংয়েরা টঙ্ক প্রথা সহ সমস্ত সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে আওয়াজ তুলেছিল এবং এই আধা ঘুমন্ত অত্যাচারীত মানুষদের একত্রিত করেছিলেন যে অতি সাধারণ নারী তিনিই রাসমণি। অষ্টাদশ শতকে ভক্তিবাদী আন্দোলনের কারণে আমরা আরেক রাসমণিকে চিনি যিনি বিখ্যাত হয়েছেন 'লোকমাতা' নামে অথচ ততটাই বিস্মৃতির আড়ালে রয়ে গেছেন হাজং নেত্রী রাসমণি। যার বৈপ্লবিক নেতৃত্ব, সমাজসেবা, আত্মত্যাগ, স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকার কথা।

রাসমণি সম্ভবত ১৮৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। যেহেতু বিবাহের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিধবা হন তাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে তাঁকে ডাইনী বলে ডাকা হতো। যদিও এই 'ডাইনীর' ডাক পড়ত প্রসবকার্য্যে। তিনি ছিলেন অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ দাই বা ধাত্রী। রুগ্ন শিশুদের চিকিৎসার জন্যে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের

কাছ থেকে ভেষজ, গাছগাছড়া, দ্রব্যের গুণাগুণ আয়ত্ব করেন। এ জাতীয় সমাজসেবামূলক কাজ তাঁকে সম্প্রদায়ের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তোলে। ১৩৫০ (বঙ্গাব্দ)-এর মন্বন্তর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সাথে যুক্ত হয়ে লঙ্গরখানা খুলে অন্ততঃ তিনটি গ্রামের মানুষের মুখে অন্ন জোগান রাসমণি। তাঁর নির্দেশে খাদ্যসংগ্রহকারী দল, চোরাব্যবসায়ী ও মজুতদারের গুদাম দখল করে চাল, বস্ত্র, অর্থ বাজেয়াপ্ত করত। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সমবায় প্রথায় চাষবাস, সাধারণের জন্য ধানের গোলা ও মেয়েদের জন্য কুটীরশিল্প কেন্দ্রস্থাপন করেন এই মহীয়সী নারী। প্রায় ৬৫ বছর আগে রাসমণি তৈরী করেছিলেন নৈশবিদ্যালয়, জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে রাজনৈতিক পাঠচক্র, সভাসমিতি আয়োজন করা, বাঁধ বাঁধা, খাল খনন ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়িত করেন। জমিদারদের অত্যাচার ও কু-প্রভাব থেকে হাজংদের মুক্ত করার অভিপ্রায়ে গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী দলও গড়ে তোলেন তিনি। মিছিলের পুরোভাগে থাকত নারী বাহিনী। জমিদারেরা প্রমাদ গুণেছিল এই বিশাল জন জাগরণে। কিন্তু তা আটকানোর সাধ্য ছিল না কারোর। প্রৌঢ় বয়সে রাসমণির অফুরন্ত কর্মদক্ষতা, অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা, গ্রামে গ্রামে প্রচার জ্বালিয়ে দিল হাজং বিদ্রোহের আগুন। উত্তর ময়মনসিংহের সুসং জমিদারীর তিনটি মহকুমায় অবসান ঘটলো জমিদারী শাসনের। ব্রিটিশ পুলিশরাজের পরোয়া না করে রাসমণির নেতৃত্বে বীর হাজং সন্তান-সন্ততিরা প্রতিষ্ঠা করে ক্ষুদ্রাকার গণরাষ্ট্র। যেখানে শাসকের রক্তচক্ষু নেই, জমিদার নেই, পেয়াদা নেই, তাই শোষণও নেই। ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্যাস্টিনের পরিচালনায় E.F.R. ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হানা দেয় হাজংদের গ্রামগুলিতে। নির্বিচারে গুলিবর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ এবং নারীধর্ষণ চলতে থাকে। বর্বর সেনাদল ধ্বংস করে সংগ্রামী চাষীদের গড়ে তোলা ফসল গুদাম, স্কুল, সমিতি (যৌথবাহিনীকে মনে পড়েছে?)। ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন "প্রায় একশত গ্রামব্যাপী এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসকাণ্ড ও নরহত্যার মধ্যে হাজং চাষীরা ভয়ে পলায়ন করিল না। অমানুষিক শোষণ ও উৎপীড়নের মধ্যেই যাহারা জীবন কাটায় তাহারা ধ্বংস ও মৃত্যুকে

ভয় করেনা। এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসকারী পশুশক্তির সম্মুখে হাজং চাষী অস্ত্র হাতে লইয়া রুখিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের পুরোভাগে দাঁড়াইলেন হাজং মাতা রাসমণি। রাসমণি চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাজং চাষীদের স্বতঃস্ফূর্ত ও খণ্ড খণ্ড প্রতিরোধ সংগ্রামকে ঐক্যবদ্ধ রূপ দিতে লাগিলেন।"

এমনকি জঙ্গলে সামরিক শিক্ষাশিবির বানিয়ে কৃষকদের গেরিলাযুদ্ধের কৌশল শিখিয়ে, গ্রামের পর গ্রাম প্রচার ও দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে শত্রুসেনাকে বিভ্রান্ত করে তোলেন তিনি। ৩১শে জানুয়ারী বহেরাতলী গ্রাম আক্রমণ করে ২৫ জন রাইফেলধারী সৈন্য। পঁয়ত্রিশ জন কৃষকবীর সঙ্গে নিয়ে সোমেশ্বরী নদীতীরে তাদের সাথে প্রবল যুদ্ধে অবতীর্ণ হন রাসমণি। আধুনিক অস্ত্রধারী সুশিক্ষিত সেনার সাথে তাঁর ও সুরেন্দ্র হাজং-এর নেতৃত্বে কৃষকবাহিনীর সেই যুদ্ধ ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। দশটি বুলেটে ছিন্নভিন্ন রাসমণি ঘটনাস্থলেই প্রাণ বিসর্জন দেন। হাজং রক্তে লাল হয় সোমেশ্বরীর বালুচর। আরো অনেকসংখ্যক গ্রামবাসীর প্রতিরোধে সেনাবাহিনী পিছু হঠে যায়।

কোনো একজনের মৃত্যুতে সংগ্রাম হয়তো সাময়িক ধাক্কা খায় কিন্তু থামে না। রাসমণির মৃত্যুতেও হাজং জনতা ব্যর্থমনোরথ হয়নি। তাঁরই দেখানো পথে বিদ্রোহীরা আন্দোলনকে আরো বড় আকারে ছড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে রেবতী, শঙ্খমণি সহ বহু নারী যোদ্ধার সাথে সর্বমোট ১৫০ জন শহীদ হন। শেষাবধি অবসান হয় টঙ্ক প্রথার।

অনুরাধার কথা :

মাত্র ৫৪ বছর বয়সে মারা গেলেন যে অনুরাধা গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু ১৯৭১ সালে। ওই বছরই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের মধ্যে ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন মুম্বাই-এর এলফিনস্টোন কলেজের মেধাবী ছাত্রী অনুরাধা। তথাকথিত উজ্জ্বল কেরিয়ারের হাতছানির পরোয়া না করে যুক্ত হন প্রগতিশীল যুব আন্দোলন নামে নকশালপন্থী সংগঠনের সাথে। ৭০ দশক

জুড়ে পশ্চিমভারতের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন অনুরাধা। ৭৪ সালে শিবসেনার মদতে ঘটা 'ওয়রলি' দাঙ্গা প্রতিরোধে এবং অ্যাফো-আমেরিকান বিপ্লবী সংগঠনের আদলে গড়ে ওঠা 'দলিত ব্যবস্থার' মুভমেন্টে নিজেকে নিযুক্ত করেন। জরুরী অবস্থা পরবর্তী সময়ে সিভিল লিবার্টি আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে CPDR-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন তিনি। ১৯৭৭ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সিভিল লিবার্টি কনফারেন্সে জোরালোভাবে রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির দাবিতে সওয়াল করেন। উপস্থিত ছিলেন ভি.এম. তারাকুণ্ডে, গোবিন্দ মুখোটি, ভারাভারা রাও এমনকি জর্জ ফার্নান্ডেজ, অরুণ শৌরীর মতো ব্যক্তিত্ব। CPI(ML)(PW)-কে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় করবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার জরুরী হয়ে পড়ে। এই গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে অনুরাধা মুম্বাই শহরের শান্ত জীবনযাত্রা ছেড়ে রওনা দেন নাগপুর। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব পড়ানোর কাজ করতে করতে সংগঠনের বিস্তার ঘটান সাফল্যের সঙ্গে। তাঁর আন্তরিকতা তাঁকে শিক্ষক হিসাবেও জনপ্রিয় করে তোলে। বিপ্লবী রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন বহু ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। বিচ্ছিন্ন জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলনকে এক ছাতার তলায় আনতে নিরলস পরিশ্রম করেছেন সে সময়। নাগপুর শুধু নয়, সংলগ্ন এলাকায় কাম্পতি, খাপারখোলা, জবলপুর, অমরাবতীতেও ঠিকা শ্রমিক, বিড়িশ্রমিক, রেল শ্রমিক এবং চন্দ্রপুরে কয়লাখনি শ্রমিকদের সংগঠিত করেছেন তিনি। কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়েছে তাঁকে, ফলে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি ভালোবাসা আরো দৃঢ় হয়েছে। পুলিশি হানাদারীর ফলে যখন প্রকাশ্য কাজকর্ম অসম্ভব হয়ে পড়ে, অনুরাধা চলে যান বস্তারে গোন্দ আদিবাসীদের মধ্যে, তিনবছর সেখানে অতিবাহিত করে তাদের সমস্যা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রাকে গভীরভাবে অধ্যায়ন করলেন। কী করে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে হয় তা হাতে কলমে দেখালেন এই বিপ্লবী নারী। মহিলাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা, রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির গড়ে সচেতন করতে থাকেন আদিবাসীদের। শুধুমাত্র তাত্ত্বিক নেতামাত্র না হয়ে থেকে

একজন প্রকৃত গেরিলা যোদ্ধার মতোই বহন করতেন রাইফেল। তা তৈরির কাজটিও শিখে নেন একসময়। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও সচেতনতা একবার তাঁকে পুলিশের গুলিতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়। পশ্চিম বস্তারের ন্যাশনাল পার্ক অঞ্চলে ১৯৯৭ সাল নাগাদ তীব্র দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অসহ্য গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ায় তিনি প্রথমবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। অসুস্থ শরীরেও তীব্র ইচ্ছাশক্তির বলে ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রতিরোধ কার্যে। তখন সেখানে ফসল ফলানো ও সুষম বণ্টনের কাজ চলছিল। শুরুটা করেছিলেন শূন্য থেকে। কঠোর অধ্যাবসায় ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলতো সম্পূর্ণ অচেনা পরিবেশেও। সাধারণ CPI(ML)(PW) কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করে পরবর্তীতে হয়ে ওঠেন বিদর্ভ রিজিওন্যাল কমিটি মেম্বার। যখন AILRC প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৮৩ তে, তিনি ছিলেন অন্যতম স্থপতি। বিদ্যার্থী প্রগতি সংগঠন, স্ত্রী চেতনা, অল মহারাষ্ট্র কামগার ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠন, গড়ার প্রধান স্থপতি ছিলেন তিনি। নারীমুক্তির প্রশ্নে কাজ করে চলা অনুরাধা অসংখ্য তত্ত্বগত ও মতাদর্শগত প্রবন্ধ লিখেছেন সব ধরণের পত্রপত্রিকায়। মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অস্পৃশ্যতা, নারী স্বাধীনতার ওপর সুচিন্তিত প্রবন্ধের পাশাপাশি আক্রমণ করেছেন বুর্জোয়া নারীবাদ ও উত্তর আধুনিক চিন্তাকে। ইংরেজি, হিন্দি, মারাঠী ভাষায় স্বনামে ও ছদ্মনামে লিখেছেন, পিপলস্ মার্চ, জনসংগ্রাম, কলম ইত্যাদি পত্রিকায়। অনুবাদ করেছেন চেরাবান্দারাজুর কবিতা। ভারতে জাতপাত প্রশ্নে তাঁর তৈরি পলিসি পেপার পূর্বতন CPI(ML)(PW) পার্টি দলিল হিসাবে গৃহীত হয়। ২০০৭ সালের ঐক্য কংগ্রেসে CPI(Maoist)-এর একমাত্র মহিলা মেম্বার হিসাবে যোগদান করেন কেন্দ্রীয় কমিটিতে। সাড়ে তিনদশকের সুদীর্ঘ কার্যকলাপ তাঁকে উন্নীত করেছিল দন্ডকারণ্য-বিদর্ভের বিপ্লবী নারী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেত্রী হিসাবে। তাঁর সারা জীবনের লড়াই এটাই প্রমাণ করে যে নারীমুক্তি আন্দোলন আদতে শ্রেণীসংগ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মধ্যবিত্ত সুলভ বিপ্লবী বাগাড়ম্বর ও কেরিয়ার সর্বস্বতার মুখে লাথি মেরে বেরিয়ে এসেছিলেন অনুরাধা গান্ধী। তাঁর জীবনযাপন, শিশুসুলভ সারল্য এবং

সকলের সাথে মিশে যাওয়ার দুর্লভ গুণ যেকোনো কমিউনিস্ট বিপ্লবীর সম্পদ।

একথা সত্য যে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে খুবই মর্মান্তিকভাবে, গোপন জীবনযাত্রার জন্যে উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ, বা সময় কোনোটাই পাওয়া যায়নি। দুরারোগ্য ব্যাধিকে শেষ পর্যন্ত জয় করতে পারেননি শ্রীমতি অনুরাধা গান্ধী। কিন্তু মৃত্যুতেই তো সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। কোনো মৃত্যুতে মানুষ বিস্মৃত হয় আবার কোনো মৃত্যু তাকে অমর করে। সব হারা জনতার তরে যদি মরণ হয় তাহলে অমন হিমালয় পর্বতও তার ওজনের কাছে তুচ্ছ। চলমান বিপ্লবী ও নারী আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক অনুরাধা চিরকাল বেঁচে থাকবেন শ্রমজীবী জনতার হৃদয়ে। কারণ তিনি ছিলেন মৃত্যুর চেয়েও বড়ো।

সংগ্রাম প্রবহমান :

ফরাসী বিপ্লবকে নিয়ে ইউজিন দেলাক্রোয়ার আঁকা সেই অসামান্য ছবি Liberty Leading the people। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত বিপ্লবী নারী ছুটছেন। তাঁর এক হাতে পতাকা, ওপর হাতে রাইফেল। ১৭৮৯-এর ১৪ই জুলাই, চুরমার হয়ে গেল অত্যাচারের প্রধান কেন্দ্র বাস্তিল। শুধু ফ্রান্স নয়, গোটা ইউরোপের রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছিল ফরাসী বিপ্লব। সেদিন গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছিলেন নারীরা। আবার ১৮৭১-এর মার্চ মাস। ভোরবেলায় প্যারিসের অনভিজাত নারীরা পুরুষদের জাগিয়ে তুলে ভার্সাই সরকারের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সমাবেশিত করেছিলেন। সূচনা হয় প্যারি কমিউন। কমিউনের অন্যতম নেত্রী লুইসি মিশেল নিশ্চিন্ত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে, নিজের আদর্শে অটল থেকে বলেছিলেন, "মেয়েদের মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য আসতে পারে একমাত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সনাতন ধারনা ও মূল্যবোধকে দু-পায়ে মাড়িয়ে"। ১৯১৭-র ৮ই মার্চ। মহান ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সূচনাই হলো শ্রমজীবী নারীদের হাত ধরে। হাজার হাজার রুশ মহিলা রুটি, জমি ও শান্তির দাবি নিয়ে নেমে এলেন পেট্রোগ্রাদের রাস্তায়। ৮ই মার্চ একটি মাইলস্টোন মাত্র। নকশালবাড়ির কৃষক রমণীরা যেদিন বুক পেতে দেন

পুলিশের গুলির মুখে সেদিনটিও নিশ্চিত নারী দিবস। চন্দনপিঁড়ির অহল্যা, সরোজিনী, উত্তমী যেদিন শহীদ হন বা কলকাতার রাজপথে লুটিয়ে পড়েন লতিকা, অমিয়া, প্রতিভারা সেটিও কি একটি নারী দিবস নয়? প্রীতিলতার পথ ধরেই উঠে এসেছিলেন তেলেঙ্গানার শহীদ লাছাক্কা বা নির্মলা কৃষ্ণমূর্তি। ভারতের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যই তাঁদের পথ করে দিয়েছিল। তাঁদের বারংবার আবির্ভাব প্রতিষ্ঠা করে একটি সহজ সত্যের যেটা মার্কস ১৮৬৮ সালের ১২ই ডিসেম্বর লুডাভিগ কুলেগম্যানকে এক চিঠিতে জানিয়ে গেছিলেন।

"যারাই ইতিহাসের কিছু জানেন, তারা এও জানেন যে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া বিশাল কোন সামাজিক বিপ্লব সম্ভব নয়।" তাই অনুরাধা আর রাসমণি একই বিপ্লবী সত্ত্বার অংশ বিশেষ, শুধু আবির্ভাব ঘটেছে ভিন্ন সময়ে। না, কোনো জন্মান্তরবাদের অযৌক্তিক গল্প নয়। যতদিন নারীর প্রতি কুৎসিত হিংসা, সামন্ততান্ত্রিক অনাচার বলবৎ থাকবে, থাকবে রাষ্ট্র ও শাসকের চোখরাঙানী, ঝরবে মানুষের চোখের জল ততদিন ঘাসে বারুদের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হবেন রাসমণি-অনুরাধারা। ইতিহাসের নিয়মেই।

মানবী এখন, মার্চ, ২০১১

সন্ত্রাস, নৈরাজ্যবাদ ও মার্কসবাদী উত্তরণ
–প্রসঙ্গ ভগৎ সিং

অগাস্ট বৈলেয়ন্ট (Vaillant)। ফরাসী নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবী। প্রথম দিকে নিযুক্ত ছিলেন শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে, ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করতেন, কিন্তু তৎকালীন ফ্রান্সে যে স্বৈরাচারী শাসকেরা গায়ের জোরে অন্যায় শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখতে চায় তাদের ওপর এসব আন্দোলনের কোনো প্রভাব পড়েনি। বৈলেয়ন্ট ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯৩ ফ্রান্সের বিধানসভায় একটি বোমা নিক্ষেপ করেন। কয়েকজন সামান্য আহত হলেও কেউ মারা যাননি, কারণ তিনি কাউকে হত্যা করতে

চাননি। বলেছিলেন "বধিরকে শোনাতে উচ্চ কণ্ঠের প্রয়োজন, একথা ভেবেই আমি বিধানসভায় বোমা ছুঁড়েছি, আমার উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার। ঘুমন্ত শাসক-শোষকবর্গের আসন্ন রক্তক্ষয়ী বিপ্লব সম্পর্কে হুঁশিয়ারী দেওয়া।" ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪ ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁর শেষ শ্লোগান ছিল 'Death to the bourgeoisie, long live anarchism.'

১৯২৯-এর ৪ই এপ্রিল বটুকেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে ভগৎ সিং যখন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছেন এবং কিছুকাল পরেই তাঁকে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী, নৈরাজ্যবাদী নামে, তরুণ বিপ্লবী কী অসামান্য ক্ষুরধার যুক্তিতে সে সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করছেন সেই আলোচনায় প্রবেশের আগে সংক্ষেপে দেখে নিতে হবে তৎকালীন ভারতবর্ষের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিকে। শুরুটা ১৮৭৯ সালে। সর্বপ্রথম বাসুদেব বলবন্ত ফাদকের সশস্ত্র দল গড়ে বিদ্রোহ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল ঠিকই কিন্তু বপন করে দিল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের বীজ। বাংলায় মাথা চাড়া দিয়েছে সশস্ত্র আন্দোলন। ১৯০৮ সালে উল্লাসকর, বারীন্দ্রকুমারের তৈরী বোমায় কিংসফোর্ডকে মারতে ব্যর্থ ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকী শহীদ হয়েছেন। এ ঘটনাকে লক্ষ্য করে তিলক কেশরী পত্রিকায় লিখেছেন-

The military strength of no govt. is destroyed by bombs, the bombs has not the power of crippling the power of an army, nor does the bomb possess the strength to change the current of military but owing to the bomb the attention of govt. is attracted towards the disorder which prevail owing to the pride of military strength. [১] [Keshri-22nd June, 1908]

এই দৃষ্টি আকর্ষণের কথা ভগৎ সিং-এর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হবে ভবিষ্যতে, অ্যাসেম্বলিতে বোমা ফেলার পর। সন ১৯১২, ডিসেম্বর মাসে রাসবিহারীর শিষ্য নদীয়ার এক অখ্যাত গ্রামের কিশোর বসন্ত মোক্ষম বোমাটি মারলেন দিল্লির রাজপথে, টার্গেট বড়লাট হার্ডিংস। কোনো মতে লাটসাহেব

প্রাণে বাঁচলেও মহাপরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আঁতকে উঠেছিল সেদিন। সর্বমোট চারজনের মৃত্যুদণ্ড হয়। অন্যতম অবোধবিহারী ফাঁসির মঞ্চে তাঁর শেষ ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন এই বলে- 'আমি চাই এই আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে যাক, এ আগুনে আমি তুমি আমরা সবাই ছাই হবো, তার সাথে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে আমাদের দাসত্ব।'[২] এ একেবারে নৈরাজ্যবাদের গোড়ার কথা। ফাদকের গ্রেপ্তারের পর তার বক্তব্যও অনেকটা এইরকম- 'My life alone will not given but thousands of others will be killed.'

এই যে ধ্বংসের সর্বগ্রাসী ভাবনা যার মধ্যে নিহিত ছিল নৈরাজ্যবাদী ধারণা, তা ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে। উল্লেখ্য গদর পার্টির প্রতিষ্ঠাতা লালা হরদয়াল ছিলেন নৈরাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক। অকল্যান্ডে গিয়ে তিনি 'বাকুনিন ইনস্টিটিউট অফ ক্যালিফোর্নিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন। হার্ডিঞ্জ কাণ্ডের সময় কমরেড ভগৎ সিং-এর বয়স মাত্র ছয়। তখন তিনি মাঠে কাঠি পুঁতে বন্দুকের চাষ করছেন। বোঝা যায় শিশুমনে এ ঘটনার ভীষণ প্রভাব ফেলেছিল। ১৯১৫ তে ব্যর্থ হয়েছে রাসবিহারী বসুর সেনা বিদ্রোহের প্রচেষ্টা, ফাঁসি হয়েছে কর্তার সিং সারাভা (ভগৎ সিং-এর আদর্শ) ও আরো অনেকের। চার বছর পর জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। এই দুটি ঘটনা সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল তাঁকে। জেনেছেন বিশ্ববিপ্লবের ইতিহাস। বাকুনিনের 'রাষ্ট্র এবং ঈশ্বর' গ্রন্থটি গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ করেছেন। নৈরাজ্যবাদ শুধু নয়, মার্কস, এঙ্গেলস, প্লেখানভ, লেনিন, ট্রটস্কি যতটুকু পেয়েছিলেন অদম্য উৎসাহে শেষ করেছেন। পড়েছেন গোর্কি, ডস্তয়ভস্কি, ভিক্টর হুগো, আপটন সিনক্লেয়ার, ডিকেন্স, শ এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তাঁর লেখা বিস্ময়কর প্রবন্ধ 'পাঞ্জাবের ভাষা ও লিপির সমস্যা'তে কবি নজরুলকে বর্ণনা করেছেন বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে।[৩]

আবার ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে কীর্তি পত্রিকায় 'নয়ে নেতাও কো আলগ আলগ বিচার' নিবন্ধে সুভাষচন্দ্র ও নেহেরুর তুলনা প্রমাণ

করছে কি অসম্ভব দূরদর্শী ছিলেন তিনি। একজন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী থেকে পরিপূর্ণ মার্কসবাদীতে উত্তরণ কোনো Magical Way-তে হয়নি। স্বল্প জীবনে অসম্ভব অধ্যয়ন আর লড়াকু মানসিকতা তাঁকে উন্নীত করে প্রকৃত কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে। সাথী শিব বর্মা লিখছেন ভগৎ সিং ও শুকদেব দুজনেই বাকুনিনের দর্শনে বিশেষ প্রভাবিত ছিলেন, সেই অবস্থান থেকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় ফিরিয়ে আনার কৃতিত্ব মূলত দুজনের; কমরেড সোহন সিং জোশ এবং লালা ছবিল দাশ। কমরেড জোশ ছিলেন 'কীর্তি' পত্রিকার সম্পাদক যেখানে ১৯২৮ সালের মে মাস থেকে ভগৎ সিং ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। বিষয় ছিল নৈরাজ্যবাদ।[৪] প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো ওই বছরের ২১-২৪ শে ডিসেম্বর কলকাতায় শ্রমিক-কৃষক দলের (Workers and Peasant Party) সারা ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[৫] সভাপতিত্বে ছিলেন এই সোহন সিং জোশ। উপস্থিত ছিলেন তাবড় কমিউনিস্ট নেতারা, ঘাটে, পি. সি. জোশী, মুজফফর আহমেদ, আব্দুর রেজ্জাক খাঁ প্রমুখ। দর্শকদের মধ্যে গোপনে এসেছিলেন ভগৎ সিং স্বয়ং।[৬] হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশান (HSRA) ও তার সদস্যদের যারা শুধুই একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে দেখতে চান, ভগৎ সিং ও তাঁর সাথীদের বৈপ্লবিক উত্তরণটাকে এড়িয়ে যেতে চান তাঁরা। একজন সশস্ত্র সংগ্রামের বিশ্বাসী বিপ্লবীর নৈরাজ্যবাদের প্রতি আকর্ষণ থাকতেই পারে, কমরেড সিংয়েরও ছিল, তবে তা থেকে ওই বয়সে পরিপূর্ণ মানসিক গুণে ঋদ্ধ মার্কসবাদী হয়ে ওঠা ওঁর মতো অনন্যসাধারণ ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। সাম্যবাদের অন্তিম আদর্শও রাষ্ট্রের বিলোপ চায়, কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা মনে করেন রাষ্ট্রের বিলোপের মাধ্যমেই জনগণের মুক্তি সম্ভব। এই ধারণার প্রতি সর্দার ভগৎ সিং সহানুভূতিশীল ছিলেন ঠিকই তবে পরবর্তীতে বিশ্বমানবসমাজকে পুঁজিবাদের শৃঙ্খল এবং যুদ্ধের সর্বনাশা সঙ্কট থেকে রোখার জন্য সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের ধারণাকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেন।

অ্যাসেম্বলিতে বোমা বিস্ফোরণের প্রেরণা যার কাছ থেকে পেয়েছিলেন

সেই বৈলেয়ন্ট ছিলেন প্রকৃত অর্থেই নৈরাজ্যবাদী। বোঝাই যাচ্ছে চিন্তাচেতনা ও মতাদর্শে ভগৎ সিং তাঁর পূর্বসূরীকে ছাপিয়ে গেছিলেন। 'অ্যানার্কিজম'-এর বদলে শ্লোগান তোলেন 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। বিপ্লবের প্রশ্নে এবং সন্ত্রাসবাদী হিসেবে তাঁকে, তাঁর সহযোগীদের যে সমালোচনা করা হয় তার প্রত্যেকটির জবাব তিনি নিজেই দিয়েছেন। এ প্রশ্নে বলা দরকার নৈরাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসবাদ এক জিনিস তো নয়ই বরং তাদের মধ্যে মূলগত অনেক তফাৎ আছে। প্রায়শই দুটিকে এক অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখনও পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয়নি। একে নির্দিষ্ট মতবাদের ওপর দাঁড় করানো যাবে না, অন্যদিকে নৈরাজ্যবাদ একটি তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত যার অর্থনৈতিক ভিত্তি রয়েছে। আধুনিক নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তা পিটার ক্রুপটক্রিন একে চারভাগে ভাগ করেছেন।[৭] প্রথম ধারাটি অরাজনৈতিক, প্রবক্তা মাক্স স্টান্দর নামে এক জার্মান, এখানে রোমান্টিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী ধারা রাজনৈতিক হলেও সমাজবাদী নয়। প্রবক্তা প্রুঁধো। তাঁর আদর্শ ক্ষুদে উৎপাদকদের দিয়ে গড়া সমাজ। তৃতীয়টি শান্তিবাদী অ্যানার্কিস্ট, যেমন ছিলেন টলস্টয়। গান্ধীকে ও অনেকে একই দৃষ্টিকোণ থেকে নৈরাজ্যবাদী বলে থাকেন। চতুর্থ ধারাটি নিয়েই আমরা আলোচনা করছি যেটাকে ইতিহাসে অ্যানার্কিস্ট কমিউনিজম বলে। রাষ্ট্র এবং অর্থনীতি সম্পর্কে এঁদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত রয়েছে। ভগৎ সিং অ্যানার্কিস্ট ছিলেন না, সন্ত্রাসবাদী তো ননই। জেল থেকে পাঠানো ইস্তেহার, চিঠি এবং রচনাগুলি (দুর্ভাগ্যবশতঃ যার অনেককিছুই পরবর্তী প্রজন্মের হাতে আসেনি, জেলজীবনে তিনি চারখানা বই লেখেন)[৮] যতটুকু পাওয়া গেছে তা পড়লে এর পিছনে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনটি ধারা রয়েছে, প্রথমটি সশস্ত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ; অহিংস এবং আপোষ আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর; তৃতীয়টি মার্কসবাদী গণ আন্দোলনের ধারা। কমরেড সিংয়ের সবচেয়ে বড় অবদান তিনি প্রথম ও তৃতীয় এই লাইনের অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। একদিকে লালা লাজপত

রায়ের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার গুরুত্ব প্রথম অনুধাবন করেন তিনি, কারণ অত্যাচারী শাসক কেবল বোঝে বন্দুকের ভাষা, পাশাপাশি তিনি এও লিখেছেন, "মানুষের জীবন আমরা পবিত্র বলে মনে করি। মানুষের রক্ত ঝরাতে বাধ্য হই বলে আমরা দুঃখিত। তবে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সকলকে সমান স্বাধীনতা দিতে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণকে শেষ করতে বিপ্লবে কিছু না কিছু রক্তপাত অনিবার্য।" অর্থাৎ বিপ্লবীরা যে খুনি বা রক্তপিপাসু নয় তা লেখার মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। লালাজীর মৃত্যুর পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহধর্মিণী বাসন্তীদেবী একটি শোকসভায় বলেছিলেন, "আমি একজন ভারতীয় নারী হিসাবে দেশের যুবশক্তির প্রতিক্রিয়া জানতে চাই যে, লালাজীর মতো দেশবরেণ্য নেতা যদি সাধারণ পুলিশের লাঠির ঘায়ে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে সেই জাতির অপমান অবহেলার বিরুদ্ধে লালাজীর চিতা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার আগেই তারা কি ব্যবস্থা নিতে চায়?"[৯]

HSRA-এর সৈনিকেরা তুরন্ত জবাব দিয়েছিলেন, দেখিয়েছিলেন সব ভারতবাসীর রক্ত শীতল হয় যায়নি। মার খেয়ে পাল্টা মার দিতে তারা জানে। এখন এটাকে যদি কেউ শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদী (বড়ো হরফ আমার) কার্য বলে অভিহিত করেন, তাহলে তার পেছনে আলাদা কারণ আছে। L. J. Carr প্রমুখ বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা এভাবেই বিপ্লব ও হিংসাকে সমার্থক দেখিয়ে মার্কসবাদের বিরোধীতা করে থাকেন। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের ঐতিহাসিকেরা সচেতন ও অচেতনভাবে একই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ভগৎ সিংয়ের ভুল মূল্যায়ণ তার অন্যতম প্রমাণ।

বি. টি. রণদিভে বলেছেন "সর্বহারা শ্রেণীর স্বপ্নকে ও সমাজতন্ত্রের সমর্থনে তাদের দেওয়া শ্লোগান থেকেই সমাজতন্ত্রের প্রতি সাধারণভাবে তাদের সমর্থনের কথা জানা যায়, যদিও তাকে ঠিক মার্ক্সবাদে বরণ করে নেওয়া চলে না।"[১০][ভগৎ সিং-এর চিন্তাভাবনা-বিটি রণদিভে]

অথচ ওই একই প্রবন্ধে লেখক কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতি ভগৎ সিং-এর বার্তার কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে সর্বহারা শ্রেণীর চূড়ান্ত বিজয়

ও পুঁজিবাদের বিনাশের পক্ষে তাঁর কণ্ঠে সোচ্চার হচ্ছে। আসলে সেই সময় মার্কসবাদী বই, পত্রপত্রিকা ছিল অপ্রতুল, তাই অধ্যায়নের যথেষ্ট সুযোগ এবং স্বল্প জীবনকালে পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব বিচারের সময় (বড়ো হরফ আমার) তিনি পাননি একথা জানার পরেও তাঁকে মার্ক্সবাদী বলতে কারো যদি আপত্তি থাকে তাহলে তাদের বোঝা উচিত, মার্ক্সবাদ বইতে আবদ্ধ কয়েকটি বাক্যাংশ নয়, এটি একটি বস্তুবাদী দর্শন, সুনির্দিষ্ট প্রয়োগেই যার বিকাশ ঘটে। তত্ত্বের অধ্যায়ণ ভুল হয় না, ভুল বা ত্রুটি যা কিছু ঘটে প্রয়োগ কালে। সর্বোপরি একথাই বলা যে ভগৎ সিং জীবনযাপন করেছিলেন, লড়েছিলেন এবং মানুষকে ভালবেসেছিলেন একজন আদর্শ মার্ক্সবাদীর মতো, তার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের আলোকে ভারতীয় সমাজকে সবরকম শোষণের জোয়াল থেকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। হাস্যকর মনে হচ্ছে, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির তথাকথিত সভ্যপদ না থাকায় তাঁকে এই অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে ভগৎ সিং হয়তো স্বপ্নেও ভাবেননি।

শৈলেশ দে'র লেখনী থেকে তুলে ধরছি- 'ভগৎ সিং কোনো মার্ক্সবাদী দলের সদস্য ছিলেন না একথা সত্য, সে সুযোগও তাঁর ছিল না কারণ তখন মার্ক্সবাদ এতটা প্রসার লাভ করেনি আমাদের দেশে। দলীয় সদস্য না হয়েও মার্ক্সবাদকে আদর্শ হিসেবে গ্রহন করেছিলেন এটাই কি তাঁর একমাত্র আপরাধ?'[১১]

আসলে বিপ্লবী যোগেশ চ্যাটার্জীর লেখা থেকে জানা যায় দেউলি বন্দীনিবাসে কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা ভগৎ সিং ও আজাদ দিবস পালন করতে চাননি, কারণ এটা নাকি তাদের নীতিবিরুদ্ধ কাজ এই যুক্তিতে! এ প্রসঙ্গেই লেখক উপরোক্ত কথাগুলি লিখেছেন, সেই সঙ্গে একখানি অসাধারণ প্রশ্নও ছুঁড়ে দিয়েছেন গ্রন্থাকার "পরবর্তীকালে ক'জন মার্ক্সবাদী মার্ক্সবাদকে এতখানি ভালবাসতে পেরেছিলেন ভগৎ সিং-এর মতো?" [ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়, পৃষ্ঠা ১৭২]

ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্রের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "তিনি কেবল

ভারতের অন্যতম মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রথম যুগের অন্যতম মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদ ও তাত্ত্বিক। দুঃখের বিষয় ভগৎ সিং সম্পর্কে শেষের এই গুণাবলী কথা তুলনামূলক ভাবে অজানাই রয়ে গেছে।"[১২]

রণদিভে যাই বলুন না কেন বিপান চন্দ্র দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাচ্ছেন ১৯২৭-১৯২৮ সাল থেকে তিনি বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করে মার্ক্সবাদী চিন্তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন এবং ১৯২৫ থেকে ১৯২৮ অবধি তিনি পড়াশোনা করেছেন অবিশ্বাস্য পুস্তক ক্ষুধায়।

গান্ধীজী এই মহান বিপ্লবী ও তাঁর সাথীদের কার্যকলাপকে নিছক গুন্ডামি ছাড়া আর কিছু ভাবেননি। শত্রুর দুঃখেও যারা প্রাণ কাঁদতো তিনি এঁদের প্রাণ রক্ষার্থে বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেননি। কারণ তাঁর ভাষায়- "The Bhagat Singh worship has done and is doing incalculable harm to the country....The deed itself (the Act of Bhagat Singh) is being worshipped as if it is worthly of emulation. The result is goondaism and degradation wherever this mad worship is being performed."[১৩] [হত্যার রাজনীতি নিয়ে Young India পত্রিকায় প্রকাশিত মতামত, The Cult of the Bomb, 2nd January, 1931]

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন! যতীন দাসের মহত্তম আত্মদানকে যিনি Diabolical suicide বলতে পারেন, তার পক্ষে এ জাতীয় ভাবনা অসম্ভব নয়।

এবার সন্ত্রাসবাদ এবং HSRA-কে নিয়ে তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ মধ্য যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল, তার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি জেলের অভ্যন্তরে 'হিংসা অহিংসার প্রশ্নে' একটি লেখা লেখেন ভগত সিং। যেখানে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে কিছু কথা বলা আছে।

"সন্ত্রাসবাদ শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চার করার মধ্যে দিয়ে নিপীড়িত

মানুষের ভিতরে প্রতিরোধের আকাঙ্খা জাগায়, তাঁকে শক্তি দেয়, দোদুল্যমান চিত্ত ব্যক্তিরা এরই ভিত্তিতে সাহসে বুক বাঁধে, তার মধ্যে সৃষ্টি হয় আত্মবিশ্বাসের।"[৪]

এখান থেকে আপাত প্রতীয়মান যে, লেখক সন্ত্রাসবাদকে গৌরবান্বিত করছেন, তার পক্ষে ওকালতি করছেন কিন্তু নিছক খুন-জখম, দু-চারটে ইংরেজ মেরে আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না তাও পরবর্তী একটি লেখায় প্রকাশ করে দিয়েছিলেন তিনি। সে প্রসঙ্গে পরে আসবো তার আগে মুজফফর আহমেদ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ১৬-০৩-১৯৩১ তারিখে দেওয়া বয়ানে কি বলেছিলেন একটু দেখা যাক।

"প্রত্যেক বিপ্লবী সন্ত্রসবাদীদের ত্যাগ স্বীকারকে নিশ্চয় সাধুবাদ জানাবেন কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা কি বিপ্লবী? আমি নিশ্চই বলব, না। তারা বিপ্লবী নন। তারা বিপ্লবের যা প্রকৃত সামাজিক উপাদান সেই মজুর শ্রেণীর ও কৃষকসমাজের ওপর কখনোই আস্থা পোষণ করেননি।"[৫]

এই অভিযোগ ভগৎ সিং-এর ক্ষেত্রে খাটে না যিনি দ্বিধাহীন ভাবে বলছেন যে, প্রকৃত বিপ্লবী সেনাবাহিনী অবস্থান করছে গ্রামে এবং কলকারখানায় কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে কিন্তু আমাদের বুর্জোয়া নেতারা তাদের মোকাবিলা করার সাহস নেই। ঘুমন্ত সিংহের একবার তন্দ্রা টুটলে সে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে।[১৬] [তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি-২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১]

তর্কের অবকাশ আছে যে শ্রমিক-কৃষকদের তুলনায় তিনি সেই সময়ে দাঁড়িয়ে প্রফেশন্যাল রেভুল্যুশনারী বা শিক্ষিত সাহসী যুবক সম্প্রদায়ের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করছিলেন কিনা। কিন্তু যে ব্যক্তি 'মানুষের প্রতি আমরা ভালবাসা কারো থেকে কম নয়' এই রচনায় শ্রমিকশ্রেণীকে সমাজের সত্যিকারের স্রষ্টা বলে চিহ্নিত করেছেন অথচ তাদেরই প্রধান বৈপ্লবিক শক্তি বলে মনে করতেন না এই অভিযোগ ধোপে টেঁকে না। আরো একবার বলা ভালো মাত্র সাড়ে তেইশ বছরের জীবনে মার্ক্সবাদ চর্চার যথেষ্ট সময় তিনি

পাননি কিন্তু বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী থেকে একজন বস্তুনিষ্ঠ মার্ক্সবাদীতে উত্তরণটি যে ঘটেছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।[১৭]

শ্রীযুত আহমেদের ভাষায়-

"হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি এই নামে অথবা লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার কয়েদীদের শ্রমিকশ্রেণী সুলভ বিপ্লবী স্লোগানে আমার মোহ ভঙ্গ হতে দিইনি, HSRA-র সদস্যদের পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ থেকে একথা নির্ভয়ে সাব্যস্ত করা যায় যে, এই বন্ধুরা কখনোই এইসব শ্রমিকশ্রেণী সুলভ বিপ্লবী স্লোগানে আস্থা পোষণ করেননি।"[১৮]

এই উপলব্ধি যুক্তিহীনই শুধু নয় অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকও। তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্দেশ্যে জেল থেকে পাঠানো দলিলটির বয়ান কি মুজাফফর আহমেদ সাহেবের অজ্ঞাত ছিল যেটা মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার এই বয়ানের অতন্ত দেড় মাস আগে ভগৎ সিং লেখেন সমস্ত অভিযোগের সুনির্দিষ্ট জবাব সহ?

"সর্বশক্তি সংহত করে বলতে চাই আমি সন্ত্রাসবাদী নই। বিপ্লবের পথে যেদিন পা বাড়িয়েছিলাম, সেই ঊষালগ্নটুকু ছাড়া কোনো দিনই আমি সন্ত্রাসবাদী ছিলাম না। সন্ত্রাসবাদের পথে আমরা কিছুই করতে পারবো না এ আমরা সুদৃঢ় প্রত্যয়। আমাদের HSRA-এর ইতিহাস থেকেই একথার প্রমাণ পাওয়া যাবে।"[১৯]

এ ঘোষণা একজন আত্মপ্রত্যয়ী মার্ক্সবাদী যে মার্ক্সবাদ গুপ্তহত্যা বা সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদিকে একেবারে অনুমোদন করছে না।[২০]

"বোমা পিস্তলের কোনো কার্যকরীতাই নেই একথা বলে আমার উদ্দেশ্য নয় বরং আমার বক্তব্য তার বিপরীত। কিন্তু আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই নিছক বোমা ছোঁড়া শুধু অকার্যকারীই নয়, কখনও তা যথেষ্ট ক্ষতিকারকও বটে।"

ওই একই লেখায় নিয়মিত আলোচনা সভা, স্টাডি ক্লাস, প্রচার,

গণসংগঠন ইত্যাদি ধৈর্যশীল কর্মসূচীর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে বলা আছে, কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই যাকে সন্ত্রাসবাদীর দর্শন বলা যাচ্ছে না। বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজও এ কথার সমর্থন করেছেন।

"ভগৎ সিং ইহা জানিত এই বোমা নিক্ষেপ দ্বারা কতিপয় সাহেব খুন দ্বারা দেশের স্বাধীনতা আসিবে না, ভগৎ সিং বিশ্বাস করিত ইহা দ্বারা দেশ আগাইয়া যাইবে। দেশের যুবকদিগের মধ্যে আসিবে নবজাগরণ।"২১[জেলে ত্রিশবছর ও ভারতপাক স্বাধীনতা সংগ্রাম]

বাস্তবিক সেই বোমা ফেটে ধামাকারই শুধু সৃষ্টি করেনি। নিস্তরঙ্গ পুকুরে ঢেউ তোলার মতো দেশের জনসাধারণ নিজের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে। সর্বস্তরে ধ্বনিত হয় প্রতিবাদ। এই মহান বিপ্লবীর জীবনীকার জিতেন্দ্রনাথ সান্যাল (বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথের ভাই) সঠিকভাবেই লিখেছেন- "Sardar Bhagat Singh, I know was neither a terrorist nor an anarchist, therefore to discharge my duty towards my late friend; I thought of presenting his true and historical picture. In this I wanted to show that he was a communist and a internationalist and that people had misunderstood him."

গবেষক ও রাজ্যপুলিশের মহানির্দেশক অমিয়কুমার সামন্ত হিংসার প্রশ্নে গান্ধিজীর সমালোচনা ভগৎ সিংয়ের যুক্তিগুলিকে ভারহীন ও চটকদারী কথা বলে উল্লেখ করছেন।২২ 'ভগৎ সিং ও স্বাধীনতাপূর্ব সন্ত্রাসবাদের বিবর্তন' শীর্ষক প্রবন্ধে কমরেড সিং-এর বিপ্লবের ধারণার সমালোচনা করে লিখেছেন "The Philosophy of Bomb" প্রবন্ধে বিপ্লবের কথা অনেকবার আসেছে কিন্তু বিপ্লবের স্বরূপ বা পদ্ধতি সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য খুব কম আছে।" তিনি এও অভিযোগ করেছেন যে, বিপ্লবের তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক কোনো রূপই ভগৎ সিং বা সহকর্মীদের রচনায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেনি।২৩

প্রায় একশো বছরে পরে স্বাধীন রাষ্ট্রের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে

সামন্তমশাই এ কথা বলতেই পারেন। কিন্তু তাঁর অভিযোগ সত্য কি? নিম্ন আদালতে ভগৎ সিংকে প্রশ্ন করা হয় তিনি 'বিপ্লব' বলতে কি বোঝেন? উত্তরে তিনি যা বলেন তা এই রূপ-

"বিপ্লব মানে রক্তক্ষয়ী হানাহানি নয়, বিপ্লবের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কোনো প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ মেটানোরও সম্পর্ক নেই। বিপ্লবের অর্থে বোমা বা পিস্তলের চর্চাও বোঝায় না। বিপ্লব, বর্তমান সমাজব্যবস্থা যা কিনা জ্বলন্তরূপে অন্যায়ের কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন।" এর চাইতে সহজ সরল সংজ্ঞা বোধহয় আর দেওয়া সম্ভব নয়। লোভ সামলানো যাচ্ছে না আরেকটি জায়গা থেকে উদ্ধৃতি টানবার-

"তোমাকে তো বলেছি ভারতী, বিপ্লব মানেই শুধু রক্তক্ষয়ী কাণ্ড নয়, বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন।" [পথের দাবী, সপ্তবিংশ পরিচ্ছদ]

ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে বিপ্লবের আবির্ভাব ঘটে, মার্কস যাকে বলেছেন 'Locomotives of history'।[২৪] গবেষকরা যেরকম হাতে গরম সংজ্ঞা চান সেটা তো থিওরিটিক্যালি দেওয়া সম্ভব নয় তবে ইহুদি কবি জোসেফ বলশোভার তাঁর বিপ্লব নামক কবিতায় একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন-

আমি আসি। কারণ দেশের জনগণের বদলে
স্বৈরাচারীরাই সিংহাসন দখল করেছে
আমি আসি। কারণ শাসকেরা তাদের যুদ্ধের
প্রস্তুতির পাশাপাশি শান্তির রোমন্থন করে
আমি আসি। কারণ যে বন্ধন মানুষকে একত্রে
গ্রাথিত করে তা এখন শিথিল
আমি আসি। কারণ মূর্খেরা মনে করে যে
তাদের তৈরী বেড়ার মধ্যেই প্রগতি আবদ্ধ থাকবে।[২৫]

আর বিপ্লবের তাত্ত্বিক বা সাংগঠনিক দিককে ফুটিয়ে তুলতে গেলে শুধু রচনার দিকে তাকালে হবে না, লক্ষ্য করতে হবে সিং ও তাঁর সাথীদের

কার্যকলাপের উপর। এই জাত-বিপ্লবীদের স্বল্প অথচ কর্মময় জীবন তাত্ত্বিক বিচার কতটা গুরুত্ব পাবে তা বলার কাজ ঐতিহাসিক কিম্বা গবেষকদের। কিন্তু বাস্তবে তা যে পরবর্তী সমস্ত গণ আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল তা অনস্বীকার্য। তেভাগা, তেলেঙ্গানা, নকশালবাড়ি তো এই ঐতিহ্যকেই বয়ে এনেছিল। জনসমর্থনের অভাব, সন্ত্রাসবাদী ঝোঁক ইত্যাদি কারনে বিপ্লববাদী কার্যকলাপ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছিল, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল বলে যারা মনে করেন তারা ব্যর্থতার নিরিখে, সফলতার মাপকাঠিতে ব্যক্তির আত্মবলিদান, কর্তব্যনিষ্ঠাকে বিচার করার ভুল করেন। যা ইতিহাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর।

বিপ্লব যেমন কোনো রক্তক্ষয়ী, মানবতা বিরোধী ব্যাপার নয়, তেমনি ভোজসভা বা সূক্ষ্ম সুললিত সুচীকর্মও নয়, কখন কোন পথ ধরে আসবে তা বই পড়ে ঠিক করা যায় না। সাফল্য-ব্যর্থতা অনেক সময়ই নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর। সেদিক থেকে কমরেড সিংয়ের ধারণা কি উচ্চস্তরের ছিল তা তাঁরই সহকর্মী বিপ্লবী শিববর্মা স্মৃতিচারণ থেকে অনুমান করা যাবে-

"খানিক্ষণ চুপ করে থেকে ভগৎ সিং আবার বলল আমরা সবাই সৈনিক। সৈনিকের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ রণক্ষেত্রের প্রতি। তাই অ্যাকশনে যাবার কথা উঠতেই সবাই উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তবু আন্দোলনের কথা মনে রেখে কাউকে না কাউকে তো অ্যাকশনের মোহ ছাড়তে হবে। সাধারণত অ্যাকশনে যারা লড়ে বা ফাঁসিতে ঝোলে শহীদত্বের বরন মালা তাদেরই গলায় পড়ে একথা ঠিক, ইমারতের সিংহদরজায় হীরার যে অলঙ্করণ এঁদের মূল্যও তাই অথচ ইমারতের দিক থেকে দেখতে গেলে ভিতের নিচে চাপা পড়া একটা পাথরের তুলনায় এদের মূল্য কিছুই নয়.....

তাছাড়া ত্যাগ আর আত্মবলিদানেরও দুটো রূপ। এক হলো গুলি খেয়ে বা ফাঁসিতে লটকে মরা- এর চমকটাই বেশি, কষ্টটা কম। দ্বিতীয়টা হল পিছন থেকে সারাজীবন ইমারতের বোঝা বয়ে বেড়ানো। আন্দোলনের চড়াই উৎরাইয়ের মধ্যে প্রতিকূল অবস্থায় কখনও কখনও এমন সময় আসে যখন

এক এক করে সব সাথীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে যায়, মানুষ তখন দুটো সহানুভুতির কথার জন্যও লালায়িত হয়। তেমনি সময়ে যারা অবিচলিত থেকে নিজেদের পথ ত্যাগ করে না, ইমারতের বোঝায় যাদের পা টলে না, কাঁধ বাঁকে না, তিলতিল করে যারা নিজেদের গলিয়ে যায়, জ্বালিয়ে যায় যাতে প্রদীপের জ্যোতি মলিন না হয়, নিস্তব্দ পথে যাতে আঁধার না ছেয়ে আসে, সেইসব লোকের ত্যাগ আত্মবলিদান কি প্রথমোক্তদের তুলনায় বেশি নয়?"[২৬][শহীদ স্মৃতি-শিব বর্মা]

এত অল্পবয়সে যে মানুষটি যে মানুষটি হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়িকে আলিঙ্গন করেছিলেন দেশবাসী জানে না তিনি বাস্তবিক কি ছিলেন। কতটা অসামান্য চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীবী এবং সদ-হৃদয়সম্পন্ন মানুষ ছিলেন একথা অনেকেরই জানা নেই। পরবর্তী সময়ে দেশের কর্ণধারেরা সেটা জানাবার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন কি?

মৃত্যুর আগের মুহূর্তে ল্যাটিন আমেরিকার এক বিপ্লবী ঘাতকের চোখে চোখ রেখে বলেছিলেন, "তোমরা হত্যা করতে পারবে শুধু মানুষটিকে"। একই ভাবে ভগৎ সিং বলে গিয়েছিলেন, "একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা সহজ কিন্তু আদর্শকে হত্যা করা যায় না।"

প্রথম জনকে সার্ত্রে আখ্যা দেন 'তার সময়কার সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে' দ্বিতীয়জনকে একমাত্র সুভাষচন্দ্র ছাড়া সেরকম সন্মান (He symbolises the spirit of revolt that has taken possession of the country) কেউ দেননি।

প্রথমোক্ত ব্যক্তির ছবি ইদানিং জামা, টুপি, আর্মব্যান্ড মায় অন্তর্বাসেও শোভা পায়। এদেশে তিনি রূপকথার রাজপুত্র, বিশ্ববিপ্লবের আইকন। অথচ যে ব্যক্তি নিরামিষ একখানি বোমা ফেলে পৃথিবী শাসন করা ব্রিটিশ সিংহের থরহরি কম্পমান করে দিয়েছিলেন, সেই জায়গায় তাঁর একটি ছবি বা মূর্তিও নেই।

একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে রক্তঋণ শোধ হয় না। পাড়ার মোড়ে মোড়ে মূর্তি বানিয়ে, তা আবার সমাজবিরোধীদের দিয়ে উন্মোচন করে কিম্বা বুকে উল্কি এঁকে তারই পূজার ছলে তাঁকে ভুলে থাকার ভণ্ডামিটাও তুলনায় কম। ১৯৩১ সনের ২৩শে মার্চ যে ক্লান্তিহীন বিপ্লবীকে ইংরেজরা কারাবিধি লঙ্ঘন করে ফাঁসিতে লটকে দেয় তখন তার বয়েস মাত্র ২৩ বছর ৫ মাস ২৭ দিন। শহীদের জীবনকালের হিসাব সামান্য পাটিগণিতে বা বলিউডি সিনেমায় পাওয়া যায় না। যতদিন পৃথিবীতে থাকবে অন্যায়, থাকবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও। তিনি জ্বলবেন পৃথিবীর রঙে।

অনেকে তাঁকে নৈরাজ্যবাদী শিরোপা দেবেন। কারণ ফরাসী অ্যানার্কিস্টের হুবহু অনুকরণে আইনসভায় বোমা ফেলেছিলেন তিনি।

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হওয়াতে 'গোঁড়া' বিপ্লবীরা হয়তো কখনোই ভগৎ সিংকে কমিউনিস্ট বলবেন না, তবু তাঁর চিন্তাচেতনা জীবনদর্শন এবং লড়াই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট বীরদের সাথে তাঁকে একাসনে বসাবে। সুতরাং তিনি বেঁচে থাকবেন একজন কমিউনিস্ট হিসাবে।

প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে যখন বাকি সব নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা মাথা কুটে মরবে, পৃথিবীর নিপীড়িত জনজাতি যেখানে, যে প্রান্তে শেষ সম্বল হিসেবে তুলে নেবে রাইফেল, কান্না জ্বালাবে সর্বগ্রাসী দাবানল সেখানেই তিনি দেখা দেবেন সন্ত্রাসবাদী রূপে। আবার এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচয়ের উর্ধ্বে দেশবাসীর কাছে, সাধারণ মানুষের হৃদয়ে তিনি থাকবেন আলাদা এক পরিচয়, তাকে আমরা ভালোবেসে ডাকব একটি বিশেষ নামে। শহীদ-ই-আজম। শহীদ কুলে সম্রাট।

টীকাঃ-

১। সন্তোষকুমার অধিকারী, সন্ত্রাসবাদ ও শহীদ ভগৎ সিং, পৃষ্ঠা ১১

২। সন্তোষকুমার অধিকারী, ঐ পৃষ্ঠা ১৩

৩। বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবী ভগৎ সিং পৃষ্ঠা ৪৯

৪। বিনদ মিশ্র, ভগৎ সিং বিপ্লবী যুবসমাজের আলোকবর্তিকা, আজকের দেশব্রতী, ৩১শে

মার্চ,'০৫

৫। সারা ভারতের মধ্যে বাংলাতেই এই পার্টি প্রথম গঠিত হয়। নাম ছিল Workers and Peasant Party of Bengal। প্রতিষ্ঠাদের মধ্যে কুতুবদ্দিন আহমেদ, কাজী নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার অগ্রগণ্য। ২১-২৪ ডিসেম্বর পরিবর্তিত ও সর্বভারতীয় নামে সম্মেলন হয় কলকাতার অ্যালবার্ট হলে। অমিতাভ চন্দ্র, অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন (সূচনা পর্ব), পৃষ্ঠা ৪, ৫

৬। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সমাজতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন, পৃষ্ঠা ২৩

৭। সুচরিতা সেন, নৈরাজ্যবাদ ও মার্কসবাদ, অনীক, কার্ল মার্কস বিশেষ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৮৪

৮। জেল জীবনে ভগৎ সিং আরো চারটি বই লেখেন। সমাজতন্ত্রের আদর্শ, আত্মজীবন, মৃত্যু ফটকের সামনে এবং ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস। এই বইগুলির পাণ্ডুলিপি বইয়ের পাচার করার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু যেসব সাথী ও সমর্থকদের হাতে তা সুরক্ষিত থাকার ব্যবস্থা ছিল সেই ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়। ভগৎ সিং জেল ডায়েরী, অনুঃ তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৭

৯। বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃষ্ঠা ১১১

১০। অমেলেন্দু ভট্টাচার্য (সম্পা), প্রসঙ্গ ভগৎ সিং, পৃষ্ঠা ২৩

১১। বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেউলি বন্দীনিবাসে থাকাকালীন এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। যা তিনি In search of freedom গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। অথচ আজাদ হিন্দ ফৌজে নির্দিষ্ট দিনে শহীদ ভগৎ সিং দিবস পালিত হতো! ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়, পৃষ্ঠা ১৬৭

১২। বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃষ্ঠা ১৮৫

১৩। বক্তব্যের এই অংশটি ১৩৩৮ (১৯৩১) সালের ভাদ্র মাসে প্রবাসী পত্রিকায় হুবহু ছেপে দেওয়া হয়েছিল। রঞ্জিত সেন, একটি অপরাভূত বিপ্লবের প্রতি শতবার্ষিকী শ্রধাঞ্জলী, 'পশ্চিমবঙ্গ' ভগৎ সিং স্মরণ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর,২০০৭, পৃষ্ঠা ৫৯

১৪। মানিক মুখোপাধ্যায় (সম্পা), ভগৎ সিং রচনাসংগ্রহ, পৃষ্ঠা ২৯

১৫। 'কমিউনিস্ট পার্টিই সংগ্রামের পথ দেখাবে', গণশক্তি, মুজফফর আহমেদ, জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৯৬

১৬। মানিক মুখোপাধ্যায় (সম্পা), ঐ, পৃষ্ঠা ৫১

১৭। K.N. Panikkar, Celebrating Bhagat Singh, Frontline, 2nd November, 2007, P.6, 8.

১৮। কমিউনিস্ট পার্টিই সংগ্রামের পথ দেখাবে, ঐ, পৃষ্ঠা ১৯৭

১৯। মানিক মুখোপাধ্যায় (সম্পা), ঐ, পৃষ্ঠা ৫৯

২০। মার্কসবাদ গুপ্তহত্যা বা বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ অনুমোদন না করলেও শাসকের বর্ণনাতীত অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী প্রতিশোধকে অস্বীকার করে না। মার্কস যাকে বলেছেন, 'ঐতিহাসিক প্রতিশোধ'। জাতীয় মহাবিদ্রোহ, ভারতবাসীর সমষ্টিগত হিংসা বা সন্ত্রাস মার্কস যথেষ্ট সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেছেন। উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গ, ভারতীয় বিদ্রোহ, পৃষ্ঠা ১৫৬ ভারতে জুলুমের তদন্ত, পৃষ্ঠা ১৬১

২১। বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃষ্ঠা ১২০

২২। অমিয়কুমার সামন্ত, হে মহাজীবন (সুশীল ধাড়ার জীবনী), মাহিষ্য সমাজ, শতবর্ষ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪৩

২৩। অমিয়কুমার সামন্ত, ভগৎ সিং ও স্বাধীনতাপূর্ব সন্ত্রাসবাদের বিবর্তন, পশ্চিমবঙ্গ, ঐ পৃষ্ঠা ৭৮

এ প্রসঙ্গে বলা যায় Modern review পত্রিকার তরফে সে সময় সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বিপ্লব ও ইনকিলাব জিন্দাবাদ শব্দগুলি নিয়ে প্রায় একই রকম সমালোচনা করেন। কমরেড সিং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে এর যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দেন। তিনি জানান, "দেশের শাসক শোষক শ্রেণীর নির্ভরযোগ্য দালাল, প্রতিনিধিত্বকারী এজেন্সিগুলির কাছে বিপ্লব মানেই হল রক্তাক্ত, ভয়ঙ্কর, ভীতিপ্রদ একটা কর্মকাণ্ড। অপরদিকে বিপ্লবীদের কাছে এটি একটি পবিত্র শব্দগুচ্ছ।"

২৪। The Class Struggle in France, 1848 to 1850, Marx, Part iii, Consequences of June, 13, 1849

২৫। সত্যসাধন চক্রবর্তী, বিপ্লবের মার্কসীয় তত্ত্ব

২৬। N. B. A.,শহীদস্মৃতি-শিব বর্মা, পৃষ্ঠা ২৬, ২৭।

শতবর্ষের শ্রধাঞ্জলিঃ ডাঃ কোটনিস

উত্তর চীনের পাহাড়ি গ্রামগুলিতে আছড়ে পড়ছে বোমা। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে জাপ সেনাবাহিনী। এরই মধ্যে পাহাড় জঙ্গলের অভ্যন্তর মরণপণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শে প্রণিত অষ্টম রুট বাহিনীর গেরিলাযোদ্ধারা। এমনই এক যুদ্ধবিধ্বস্ত গ্রামের কুটীরে সে সময় মারা যাচ্ছেন চীনে ভারতীয় মেডিক্যাল মিশনের সর্বকনিষ্ঠ চিকিৎসক দ্বারকানাথ কোটনিস।

কে এই কোটনিস?

দ্বারকানাথ শান্তারাম কোটনিসের জন্ম আজ হতে প্রায় শতবর্ষ আগে মহারাষ্ট্রের শোলাপুরে। ১৯১০ সালের ১০ অক্টোবর। ছাত্রাবস্থায় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের রোষের শিকার হন তিনি। পিতা ছিলেন সূতাকলের শ্রমিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রভাব পড়েছিল পুত্রের ওপর। যখন লালফৌজের

জেনারেল চু-তের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তদানিন্তন জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র মেডিক্যাল মিশন পাঠাতে মনস্থির করেন তার মধ্যে স্থান করে নেন ২৪ বছর বয়সী দ্বারকানাথ। ১৯৩৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর কোয়াংচৌ-তে পৌঁছে তারা বুঝতে পারেন কুয়োমিন্টাং কর্তৃপক্ষ তাদের সাহায্য গ্রহণে আগ্রহী নয়। স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশও সেখানে ছিল না। শেষ পর্যন্ত তারা ঠিক করেন চীনের দুর্গম উত্তরাঞ্চলে মিশনকে নিয়ে যাওয়া। ইয়েনানে তখন লড়ছে অষ্টম রুট বাহিনী এবং জাপানি আগ্রাসনের ঝাঁজটাও সেখানে বেশি। যদিও মিশন নেতা ডাঃ অটল ছাড়া বাকিদের যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল না কিন্তু সাধারণ সরঞ্জাম এবং সেবা করার ঐকান্তিক আগ্রহকে সম্বল করেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন তারা। ইয়েনানে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ভারতবর্ষ থেকে এল চরম দুসংবাদ! কোটনিস পিতৃহারা হয়েছেন। সকলের আন্তরিক অনুরোধ সত্ত্বেও দেশে ফিরলেন না তরুন ডাক্তার। কারণ তার কাছে ফিরে যাওয়ার অর্থ মৃত পিতার স্বপ্নকেই অসফল করা যার নিকট থেকে দেশপ্রেম আর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার শিক্ষা অর্জন করেছিলেন তরুন পুত্র। মিশন শেষে ফিরে গিয়েছেন সবাই। ফেরেননি একজন। ফেরা সম্ভব ছিল না, কারণ তিনি এতদিনে চীনা জনগণের মুক্তির সংগ্রামকে নিজের দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে একাকার করে ফেলেছেন। এক পরাধীন দেশের নাগরিক কোটনিসের কাছে প্রেরনা হয়ে দাঁড়ালো আরেক পরাধীন জাতির অনমনীয় মুক্তিসংগ্রাম। শিখলেন চীনা ভাষা, বিবাহ করলেন প্রতিরোধ যুদ্ধ অংশগ্রহণকারী তরুণী নার্সিং শিক্ষিকা কুয়োচিন-লানকে। ছুটে চললেন এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আরেক যুদ্ধক্ষেত্রে। কখনও Bethune International Peace Hospital-এর ডিরেক্টর, কখনও Bethune Hygiene School-এর লেকচারার। এর মাঝে আন্তর্জাতিকতাবাদ, নারীমুক্তির ওপর বক্তব্য রেখেছেন। উৎপাদন অভিযান, শুদ্ধিকরণ, সাংস্কৃতিক কাজে অংশ নিয়েছেন। প্রতিনিয়ত শেখবার চেষ্টা করেছেন জনগণের কাছ থেকে। এভাবেই আসতে আসতে হয়ে উঠলেন অষ্টম রুটবাহিনীর একজন বিশ্বস্ত সৈনিক। ডাঃ বেথুনের বিপ্লবী মানবতাবাদের সার্থক প্রয়োগ ঘটাতে বাজি

রাখলেন জীবন। স্থানীয় মানুষ ভালোবেসে তার নাম দেয় ডাঃ খো, তাদের সুখ দুঃখের সাথী।

একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রমণ, খাদ্যভাব, ওষুধের অপ্রতুলতা। অপরদিকে জনগণের সর্বাত্মক প্রতিরোধ আর অফুরন্ত ভালোবাসা। মুগ্ধ হয়ে গেলেন ডাঃ কোটনিস। ডাঃ বেথুন নির্দেশিত পথেই ভ্রাম্যমান হাসপাতাল গড়ে ফ্রন্টের সঙ্গে কাজ করতে থাকেন তিনি। অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু যুদ্ধ চলাকালীন অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে প্রায় ৮০০ আহত সৈন্যের চিকিৎসা করতে সক্ষম হন তিনি। অমানুষিক পরিশ্রম ও সঠিক ওষুধের অভাবে ভেঙে পড়তে থাকে শরীর। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে মৃগীরোগে আক্রান্ত হন। যদিও বিশ্রাম শব্দটি তার অভিধানে ছিল না। যখনই জাপানি আক্রমন তীব্র হয়েছে, প্রতিরোধ হয়েছে তীব্রতর, হাসপাতাল সরিয়ে নিয়ে যেতে হয় জঙ্গলের গভীরে, পাহাড়ের গুহায়। সঙ্গে চলে চলমান স্কুল। পথ চলতে চলতে শেখে ছাত্রেরা। এরই মধ্যে কোটনিস শেষ করেছেন General Introduction to Surgery, হাত দিয়েছেন Surgery in detail লেখার কাজে। সবই চীনা ভাষায়! মৃত্যুর কয়েকদিন আগে স্ত্রীকে জানাচ্ছেন 'আমি যদি মরেও যাই তবু আমার দেশের মানুষ এই জেনে খুশি হবেন যে আমি ফ্যাসিবাদের নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্যই প্রাণ দিয়েছি' এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪২-এর ৯ ডিসেম্বর প্রায় সেবারত অবস্থাতেই সহযোদ্ধাদের ছেড়ে চলে গেলেন সর্বস্বত্যাগী এই ডাক্তার। বয়স তার তখন মাত্র বত্রিশ।

চীন-ভারত দু-দেশই তাঁকে নিয়ে ডাক টিকিট প্রকাশ করেছে। লেখা হয়েছে বই। হয়েছে চলচ্চিত্রও। তাঁর জীবনীকার শেন সিয়ান কুং সঠিক ভাবেই কোটনিসকে 'চীনে এক ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী' বলে চিহ্নিত করেছেন। স্মৃতিচারণে মাদাম সান ইয়াৎ সেন বলেছেন 'বর্তমানের চাইতে ভবিষ্যত ডাঃ কোটনিসের জন্য বেশি সম্মান অপেক্ষা করছে কারণ এই ভবিষ্যত পৃথিবীর জন্যই ছিল তাঁর লড়াই। 'আর কি বলেছিলেন অষ্টম রুট

বাহিনীর প্রধান স্বয়ং যার সাথে Ji-chai-ji সীমান্তে Wutai পাহাড়ের কাছে যোগ দিয়েছিলেন ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস?

'সৈন্যবাহিনী হারালো তাঁর এক আপনজনকে এবং জাতি হারালো তার এক সুহৃদকে। ডাঃ কোটনিসের আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রেরণাকে আমরা যেন কখনও না ভুলি। 'বক্তার নাম ছিল মাও-সে-তুং।

গণসংস্কৃতি মে, 2011

ভালোবাসার মানুষ- মুরারি

'ভালোবেসে চাঁদ হোয়ো না কো
পারো যদি সূর্য হয়ে এসো
আমি সে উত্তাপ নিয়ে নিয়ে
আঁধার অরণ্য জ্বেলে দেবো।'

পংক্তিটি প্রায় প্রবাদের পর্যায়ে উন্নীত, যদিও কবির নাম খুব সুপরিচিত নয়। কারণ কবি স্নিগ্ধ চাঁদ, গোলাপের সৌরভ কিংবা পাখির কাকলী ভরা কবিতা বাজারি পত্রিকায় বিকোননি, সমাজবদলের স্বপ্ন দেখতে দেখতে কবিতার মলোটভ ককটেল হতে গিয়েছিলেন। তাঁকে মাসুল দিতে হয়েছিল স্বপ্ন দেখার। যেমন দিতে হয়েছিল দ্রোণ, আশু, তিমির, অমিয়, সমীর ও আরো অনেককে। এঁরা সকলেই কবিতা লিখতেন, হয়তো বিপ্লবের সঙ্গে কবিতাকে কোথাও মেলাতে চেয়েছিলেন। আরো অনেকের মতোই কবি মুরারি মুখোপাধ্যায়ও ফিরে আসেননি হাজারিবাগ থেকে। তাঁর হত্যার ৪০ বছর পূর্ণ হল এ বছরে ২৫ জুলাই।

কবি মুরারি মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৫ সালের ২৫শে মার্চ কলকাতার এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। নকশালবাড়ির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠার সময় তাঁর বয়েস মাত্র ২২। আপাতশান্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের মেধাবী ছাত্র মুরারি উদাসীন থাকলেন না কৃষক বিদ্রোহের সেই দুরন্ত দ্রোহকালে। তাঁর বাগ্মিতা ও বলিষ্ঠ লেখনী ছিল তারিফ করার মতো।

আগুনের তাপে উত্তাপ নেবো মোরা
স্থালিত যুগের চিতায় আগুন জ্বালা;
শীতের ভাবনা কেঁপে হবে দিশাহারা
উঠবে শপথ পালাবদলের পালা
কবিতাঃ পালাবদলের পালা

বন্ধুমহলে, সহপাঠীদের অত্যন্ত প্রিয় মুরারি গল্প, প্রবন্ধ, কবিতার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন শোষিত মানুষের কথা। তাদের প্রতিবাদ প্রতিরোধের কথা, শ্রেণীসংগ্রামের কাহিনী। আড়িয়দহ-দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলে ছাত্রযুবকদের মধ্যে অসামান্য দক্ষতায় সংগঠন গড়ে তুলতে থাকেন তিনি। লিটিল ম্যাগাজিনের সম্পাদনা থেকে শুরু করে ফ্রি-কোচিং, ছাত্র-শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ইত্যাদি সামাজিক-রাজনৈতিক ভেতর দিয়ে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিলেন নকশালবাড়ির রাজনীতিকে। চারু মজুমদারের 'গ্রামে চলো' ও 'শ্রমিক কৃষকদের সাথে একাত্ম হও' আহ্বানে সাড়া দিয়ে মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামে গোপন কাজ করতে থাকেন তিনি। এই অকুতোভয় তরুণ ততদিন হয়ে উঠেছেন পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী, একজন নির্ভরযোগ্য সংগঠক। অনুধাবন করেছেন নকশালবাড়ির আলোকে সশস্ত্র সংগ্রামই এক ও একমাত্র মুক্তির পথ। বাংলা বিহার উড়িষ্যার সীমান্ত আঞ্চলিক কমিটির অধীনে 'আনন্দ' ছদ্মনামে রাজনৈতিক কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন এবং বহরগোড়া-চাকুলিয়া কৃষক আন্দোলনেও নেতৃত্ব দেন। ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ও হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে প্রেরণ করে এবং ১৯৭১ সালের ২৫ জুলাই জেল পালানোর মিথ্যা গল্প সাজিয়ে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে কর্তৃপক্ষ। হত্যা করে তাঁর সঙ্গী আরো ষোলোজন বন্দীকেও।

স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অরবিন্দ পোদ্দার মহাশয় তাঁর 'রক্তে ভাসে স্বদেশ সময়' লেখাটিতে শহীদ মুরারির কবি প্রতিভাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন। তাঁর ভাষায় 'ভালোবাসা কবিতাটি পাঠ করতে করতে কাব্যের সৌন্দর্যের মধ্যে সংকল্পের সংহত শক্তির প্রকাশ দেখে বিস্মিত হলাম। ওই কবিতার শেষ অংশটি এই রকম-

চাঁদ, নদী, ফুল, তারা, পাখি
দেখা যাবে কিছুকাল পরে
কেননা এ অন্ধকারে শেষ যুদ্ধ বাকি
এখন আগুন চাই আমাদের এই কুঁড়েঘরে।

আগুনের খোঁজে মুরারি ও তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী অসংখ্য সহযোদ্ধার লড়াই আজো থামেনি। আজো এই বিপ্লবীর কবিতা নতুন প্রজন্মের বিপ্লবীদের প্রেরণা জোগায়, প্রাণশক্তি সঞ্চার করে। এক বুক ভালোবাসা নিয়ে তিনি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড হতে চেয়েছিলেন। সেই ভালোবাসাকে ভয় করেছিল শাসকশ্রেণী যা বজ্র হয়ে দিকে দিকে লড়াইয়ের বার্তা ছুঁড়ে দিয়েছিল। বিপ্লবীর মৃত্যু ঘটে কিন্তু স্বপ্ন মরে না, জনগণের জন্য শোষণহীন ভারতবর্ষ গড়ার আপাত অসম্ভব স্বপ্ন দেখা এই তরুণের মৃত্যু প্রকাণ্ড হিমালয়ের ওজনের চাইতেও বহু বহু গুন ভারি। প্রতিক্রিয়াশীল শাসক জেলের অভ্যন্তরে কাপুরুষের মতো তাঁকে হত্যা করেছে, তাতে কী? বাংলার সব কটি মাটির প্রদীপে শিখা হয়ে ছড়িয়ে গেছেন তিনি, তাঁর বিনাশ নেই।

'কবিতার জ্বলন্ত মশাল
কবিতার মলোটভ ককটেল
কবিতার টলউইন অগ্নিশিখা
এই আগুনের আকাঙ্খাতে আছড়ে পড়ুক।'
[এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না- নবারুণ ভট্টাচার্য]

গণসংস্কৃতি, জুলাই, 2011

আগুনের কবি অতো রেনে কাস্তাইয়ো

'তোমার আছে বন্দুক
আর আমার আছে ক্ষুধা'

ক্ষুধার কারণেই বোধহয় সব থেকে বেশি বন্দুকের প্রয়োজন হয়। শাসক ভয় পায় ক্ষুধাকে। সাদাত হোসেন মান্টোর কথায় 'ক্ষুধা মানুষকে চরমপন্থী করে তোলে' আর কে না জানে শাসক চরমপন্থীদের ভীষণ ভয় করে। সর্বগ্রাসী খিদের আগুন যখন দাউদাউ জ্বলে তখন বন্দুক কেন, হাজার কামান, বিমান, মাইন, বন্দীশালা, ফাঁসিকাঠ কিছুই তাকে দমাতে পারে না। এ কথাই কবিতায় বলে গিয়েছিলেন অতো রেনে কাস্তাইয়ো।

গুয়াতেমালার বিপ্লবী কবি অতো জন্মগ্রহণ করেন 'কোয়েতজালতেনাঙ্গো' নামক একটি স্থানে, ১৯৩৪ সালের ২৫ এপ্রিল, সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বিপ্লবী রাজনীতিতে আকৃষ্ট অতো লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। আঠারো বছর বয়সে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা পরিচালনার

পাশাপাশি চলতে থাকে কবিতা লেখা, যেগুলি দেশের তরুন সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর তিনি গুয়াতেমালা ওয়ার্কার্স পার্টির ছাত্র সংগঠনের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন, ততদিনে তাঁর কবিতা সমীহ আদায় করে নিয়েছে সে দেশের নামকরা কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের। ১৯৫৪ সালে চক্রান্ত করে প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে আরবেনজ সরকারের পতন ঘটায় CIA, গণতন্ত্রের ওপর নেমে আসে ভয়াবহ ফ্যাসিস্ট আক্রমন। অনেকের সঙ্গে স্বদেশচ্যুত অতো আশ্রয় নেন এলসালভাদোরে। এসময় তাঁকে অসম্ভব পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়েছে। শ্রমিক, সেলসম্যান, ক্লার্ক ইত্যাদি সব রকম পেশাতেই যুক্ত থেকেছেন। এতো কষ্টের মধ্যেও ছাড়েননি কবিতা লেখা আর অধ্যয়ন। লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেমাটোগ্রাফ নিয়ে পড়েছেন, কিন্তু তাঁর আসল প্রেম ছিল কবিতা। জীবন ছিল ভ্রাম্যমান, পুরষ্কারও জুটেছে প্রচুর তাই বলে বিষদাঁতহীন বুদ্ধিজীবী হয়ে আরামে জীবন কাটিয়ে দেননি অতো রেনে কাস্তাইয়ো উল্টে তাঁর কবিতা আঙুল তুলেছে সেইসব মেরুদণ্ডহীনদের প্রতি-

'What did you do, when the poor
suffered, when tenderness and life
burned out of them?
apolitical intellectuals
of my sweet country, you will not be
able to answer'

[Apolitical Intellectuals]

তাঁর কবিতা প্রভাবিত করেছিল পাবলো নেরুদাকেও। পরবর্তীতে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গেছেন। তাঁর কবিতা প্রেরণা হয়েছে সেই সমস্ত দেশের লড়াকু মানুষদের। আকুণ্ঠ চিত্তে সমর্থন জানিয়েছেন সমগ্র পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামকে। রাজনৈতিক ঘাত প্রতিঘাত, সামরিক শাসন, বিক্ষোভ-বিদ্রোহে উত্তাল গুয়াতেমালার স্বাধীনতা যুদ্ধ আর অন্য পরাধীন দেশের মুক্তিসংগ্রাম তাঁর কাছে আলাদা মনে হয়নি। অবস্থা কিছুটা প্রশমিত হলে স্বদেশে ফিরে অতো যোগ দেন রাজনৈতিক-সংস্কৃতিক

আন্দোলনে। সান কার্লোস বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়াও সম্পন্ন করে ফেলেন একটা সময়। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গড়ে ওঠে স্টাডি সার্কেল। প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতার বইগুলি। ১৯৫৯ এ স্কলারশিপ পেয়ে এল সালভাদোর যাত্রা। কারারুদ্ধ হয়েছেন ৬৪ সালে। মুক্তি পেয়ে আবার অজানার খোঁজে পাড়ি, কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য ছিল না। যেখানেই যান একটি দিনের জন্যেও ভুলতে পারেননি তিনি প্রিয় মাতৃভূমি গুয়াতেমালাকে। ফ্যাসিস্ট শাসনে বিপর্যস্ত সেই দেশে তখন গোপনে গড়ে উঠছে বিপ্লবী সংগঠন। জনগণের একটি অংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসছে প্রতিরোধী যুক্তফ্রন্ট তৈরির কাজে। এমনই এক সন্ধিক্ষণে ১৯৬৬ সালে গোপনে স্বদেশে ফেরত আসেন অতো রেনে কাস্তাইয়ো। না, সে সময় তিনি আর শুধু সাধারণ কবি নন, শাসকের রক্তে কাঁপন-ধরানো পুরোদস্তুর মুক্তিযোদ্ধা! নাম লিখিয়েছেন গেরিলা বাহিনী 'রিবেল আর্মড ফোর্সে'। জানা যায় জাকাপা পর্বত্য অঞ্চলে তাঁর পরিচালনায় কয়েকটি সফল অভিযান করে এই বাহিনী। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯ সালের ১৯ মার্চ তিনি সহযোদ্ধাদের সঙ্গে ধরা পড়লেন সেনাবাহিনীর হাতে। কয়েকদিন বন্দী অবস্থায় অমানুষিক অত্যাচারের পর অতো ও তাঁর কমরেডদের জাকাপা বন্দীশালাতেই জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

কী আশ্চর্য! সেই দিনটিও ছিল ২৩ মার্চ! ৩৬ বছর আগের এমনই একদিনে ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামের অবিসংবাদিত নায়ক সর্দার ভগৎ সিং-কে কারাবিধি লঙ্ঘন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং গোপনে তাঁর ও তাঁর সাথীদের দেহগুলিকে পুড়িয়ে লোপাট করার ব্যবস্থা করে সাম্রাজ্যবাদী সরকার। ইতিহাস বোধহয় শহীদের জীবনীতেই সব থেকে বেশি পুনরাবৃত্ত হয়।

কবি এবং যোদ্ধা, দুই ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। সমাজে তাঁদের অবস্থানও দুই বিপরীত মেরুতে। এঁদের মধ্যে মিলের চাইতে অমিলই বেশি। কিন্তু একবার যদি এই দুই বিপরীতমুখী সত্তা একদেহে লীন হয়ে যায় তবে তা শাসক ও শোষকশ্রেণীর কাছে মারাত্মক বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই

শাসক সরোজ দত্তের বিচারের প্রহসনটাও করার সাহস পায়নি। কাপুরুষের মতো হত্যা করেছে সুব্বারাও পানিগ্রাহীকে, খুন করা হয় কবি লোরকাকে। বিচারের প্রহসনান্তে একইভাবে মারা হয় বুলগেরিয়ার শ্রমিক কবি নিকোলাস ভ্যাপৎসারভকে। অতো রেনে কাস্তাইয়ো ছিলেন এঁদেরই মতো আরেক নির্ভীক সৈনিক।

এত হত্যা করে কি কবির কণ্ঠরোধ করা গেছে? ক্ষুধাকে দমন করা গেছে রক্তপাতের ভয় দেখিয়ে? উত্তরটি কবি অতো দিয়ে গেছেন-

তবু শেষটায়
আমার কিন্তু চিরকাল থাকবে
তোমার চেয়ে বেশি হাতিয়ার
যদি তোমার থাকে বন্দুক
আর আমার কেবল ক্ষুধা।

গণসংস্কৃতি, অগাস্ট 2011

আফগান নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্নিশিখা
মীনা কেশওয়ার কামাল

I am the women who has awoken
I have arisen and become a temptest through
the ashes of my brunt children
I have arisen from the rivulets of my brother's blood....
I have found my path and will never return
-Meena Keshwar Kamal.

কবিতাটির লেখিকা নিশ্চিতভাবেই তাঁর পথ খুজে নিয়েছিলেন নারীমুক্তি আন্দোলনের মাঝে, গণবিপ্লবের সরণীতে এবং শেষ পংক্তির মতো সত্যিই আর ফিরে আসেননি কারণ তাঁকে জীবন দিতে হয় ঘাতকের বুলেটে। মধ্যযুগীয় শাসন ও ধর্মের নামে ভয়াবহ হিংস্রতার বিচারে প্রথম সারিতে যে দেশগুলির নাম উঠে আসে, আফগানিস্তান তাঁদের অন্যতম। জন্মলগ্ন থেকে

ধর্মীয় কু-শাসনের নিগড়ে বাঁধা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ভাগ-বাঁটোয়ারা, গৃহযুদ্ধ ইত্যাদিতে অর্থনৈতিকভাবে চূড়ান্ত বিপর্যস্ত, ক্ষতবিক্ষত এই দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন, শিশুহত্যা, নারীহত্যা অতি সাধারণ ঘটনা। তালিবাণী অপশাসনে নারীদের অবস্থা কি মর্মান্তিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'নারী স্বাধীনতা' শব্দটিই সেখানে অলীক কল্পনা মাত্র!

সাউর রেভোলিউশন (৭৮ সালের ক্যু-দেতাকে এই নামে ডাকা হয়ে থাকে) ক্ষমতার হাতবদল ঘটায় বটে কিন্তু মৌলিক পরিবর্তন কিছুই হয়নি। উপরন্তু নয়া ঔপনিবেশিক শক্তি পরিচালিত পুতুল সরকার উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে পরিশেষে যা রূপ নেয় রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে। ফলতঃ নারী স্বাধীনতার প্রশ্নটা বরাবরের মতো অবহেলিতই থেকে গেছে যুদ্ধবিগ্রহ, অভ্যন্তরীণ বিবাদে শতদীর্ণ আফগানিস্তানে। সে দেশ রূপ নিয়েছে বধ্যভূমির। বিশেষত নারীদের ক্ষেত্রে। তবে বধ্যভূমিতেও গোলাপ ফোটে। শাসন নিপীড়নের প্রাবল্য উপেক্ষা করে প্রতিবাদের জন্ম হয় নিজস্ব নিয়মে। জীবন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। করবেই। আর জীবন দিয়ে এই কথাটির প্রতিষ্ঠা দিয়ে যান আফগান নারীমুক্তি আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেত্রী মীনা কেশওয়ার কামাল।

মীনার জন্ম ১৯৫৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী কাবুলে। স্কুলজীবন থেকে ছাত্র রাজনীতিতে যোগ দেন। শুধু নারী অধিকারের দাবীতেই নয় অন্যান্য সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছিল তাঁর স্বচ্ছল পদচারণা। তিনি ছিলেন একধারে কবি, সমাজকর্মী ও মানবাধিকার আন্দোলনের একজন আপোষহীন সেনানী। মাত্র কুড়ি বছর বয়েসে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন গড়ে তুলেছিলেন Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA), অল্প কিছুকালের মধ্যে যা হয়ে উঠল দেশের সর্বাগ্রগণ্য প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠন। ১৯৮১ সাল থেকে প্রকাশিত হতে থাকে একটি দ্বিভাষিক পত্রিকা পায়াম-ই-জান যেখানে দেশীয় মৌলবাদ ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দালালদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াই চালান

মীনা ও তাঁর সহযোগীরা। পরবর্তীতে তিনি বিবাহ করেছেন আফগানিস্তান লিবারেশন অর্গানাইজেশনের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট কর্মী ফয়েজ আহমেদকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ডঃ ফয়েজ আহমেদকেও ১৯৮৬ সালে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নৃশংসভাবে খুন করে।

শুধুমাত্র রাজনীতিতেই মীনার কর্মকাণ্ড থেমে থাকেনি, উদবাস্তু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, হসপিটাল, মহিলাদের জন্য কুটির শিল্পকেন্দ্র স্থাপনা ইত্যাকার সামাজিক কাজ তাঁকে দিল অভাবনীয় জনসমর্থন যা শঙ্কিত করে তুলল তালিবানী গোষ্ঠীগুলিকে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বদেশের নারীদের কথা তুলে ধরে তিনি তৎকালীন পুতুল সরকার তথা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদেরও মাথাব্যাথার কারণ হয়ে উঠলেন যার জন্য তাঁকে CIA এর দালাল, অতিবাম-নৈরাজ্যবাদী প্রভৃতি নানাবিধ হাস্যকর কুৎসারও সম্মুখীন হতে হয়েছে।

অবশেষে, ১৯৭৮-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী KGB মদতপুষ্ট সিক্রেট পুলিশ KHAD-এর গুন্ডাবাহিনী ও ভাড়াটে মৌলবাদী জঙ্গীরা মীনাকে হত্যা করল নিজ বাসভবনে, পাকিস্তানের কোয়েত্তা-তে। গনতন্ত্র, নারীমুক্তি ও স্বাধীনতার দাবিতে এক যুগ ধরে বিরামহীনভাবে কাজ করে চলা মীনা কেশওয়ার কামাল এভাবেই প্রাণ দিলেন মানবতার শত্রুদের হাতে। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে! আফগান মহিলাদের ঘুমন্ত সিংহর সাথে তুলনা করেছিলেন এই বিপ্লবী রমণী, যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া দেশে প্রকৃত বিপ্লব সম্ভব নয় একথা সঠিকভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন তিনি।

ঔপনিবেশিক শক্তি দেশীয় মৌলবাদী বর্বরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁকে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে এবং করছে আরো অগণিত বিপ্লবীকে। কমিউনিজমের আড়ালে পররাজ্যলোভী সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে হটিয়ে এখন সেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ স্ব-মহিমায় অধিষ্ঠিত। ঘটে চলেছে একের পর এক যুদ্ধাপরাধ, ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে মানবাধিকার। কিন্তু স্বপ্ন মরে না, মীনার সাথীরা ও অসংখ্য বিপ্লবী যোদ্ধা দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত মরণপণ

সংগ্রামে অবতীর্ণ। আজও যখন 'কাবুলিওয়ালার দেশে' কোনো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ হয়, মুষ্টিমেয় গেরিলার ভয়ে থমকে দাঁড়ায় 'বিশ্বজয়ী' মার্কিন কনভয় কিংবা বোরখা ছুঁড়ে ফেলে রাস্তায় নামেন বিদ্রোহী নারীরা, তাঁরা নিশ্চিতভাবেই বহন করেন তাঁদের পূর্বসূরি শহীদ মীনা কেশওয়ার কামালের সংগ্রামী চেতনা।

মানবী এখন, মার্চ, ২০১২

এক বিস্মৃত বিপ্লবী

১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাস। প্রবল ঠাণ্ডা, শাপদ সংকুল অরণ্য, দুর্গম গিরিপথ ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছেন কতিপয় বাঙালী তরুণ। সখের ভ্রমণ অভিযান নয়, নয় কোনো শান্ত মৌন মিছিল। জাপ সামরিক শাসনে বিপর্যস্ত বর্মা থেকে পালাবার সবকটি রাস্তা প্রায় রুদ্ধ। সমুদ্রপথ থেকে শুরু করে চতুর্দিকে কড়া প্রহরা, যাতে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্যও পালাতে না পারে।

একটি মাত্র পথ খোলা। আরাকান পর্বত অতিক্রম করে মণিপুর ও নাগাল্যান্ডের ভেতর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করা যায়। হাজার হাজার বর্মা প্রবাসী ভারতীয় ইতিপূর্ব এই পথে ফেরার চেষ্টা করেছেন। অনেকেই মারা গেছেন ভয়াবহ মারণ রোগ কলেরায়, হিংস্র পশুর আক্রমনে, ঠাণ্ডা কিংবা ক্ষুধায়, পথশ্রমে।

এই ছোট্ট দলটি সেই পথ ধরেই ধাবমান। তাঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন একজন পুরোদস্তুর ডাক্তার এবং বর্মা কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য ডাঃ অমর নাগ। এই দুর্দান্ত যাত্রায় তাঁর সাথী বিপ্লবীরা ছিলেন গোপাল মুন্সী, গোবিন্দ ব্যানার্জী (যিনি কলেরা আক্রান্ত হয়ে পথেই মারা যান), মাধব মুন্সী

প্রমুখ। এর প্রায় দু'মাস বাদে পাহাড় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ২৯০ মাইল পদব্রজে এসে ইম্ফল-কোহিমা-ঢাকা হয়ে তাঁরা প্রবেশ করবেন কলকাতায়।

১৯১৭ সালের অক্টোবর বর্মা মুলুকে জন্মগ্রহণ করেন অমর নাগ। পিতা ছিলেন সে দেশের উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী। ১৯৩৫ সালে রেঙ্গুনের বিখ্যাত বেঙ্গল অ্যাকাডেমী থেকে ম্যাট্রিক ও ১৯৪১-এ ডাক্তারি পাশ করেন কৃতিত্বের সাথে। অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দুই গোষ্ঠীর বিপ্লবীদের সঙ্গেই তাঁর ছাত্রাবস্থায় যোগাযোগ ঘটে, তাঁদের প্রভাবে সশস্ত্র বিপ্লববাদে হাতেখড়ি হয় অমর নাগের। কমিউনিজমে আকৃষ্ট হন বর্মা কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রবীণ ব্যক্তিত্ব হরিনারায়ণ ঘোষালের সংস্পর্শে। ১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশের অবিসংবাদিত নেতা আউং সানের (বর্তমান জননেত্রী ও নোবেল জয়ী সু-চি'র পিতা) ডাকে ডাঃ নাগ ও তাঁর সহকর্মীরা ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন। খনিজ তেল শ্রমিক মহলে তাঁর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে গিয়েছিল খুব সহজেই। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে আউং সান-কে সম্পাদক নির্বাচিত করে প্রতিষ্ঠা হল কমিউনিস্ট পার্টি যা অচিরেই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ধরপাকড় ও নানারকম দমন পীড়নের মধ্যেই শ্রী নাগ সে দেশের বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে সংগঠিত করার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। সে সময় বর্মায় ভারতীয় শ্রমিকের সংখ্যা বেশি ছিল, বাংলা উড়িষ্যা অন্ধ্রপ্রদেশের গরীব জেলাগুলি থেকে হাজার হাজার মানুষ মজুরের কাজ নিয়ে আসতেন, তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব বিস্তার করে ফেললেন এই বাঙালী বিপ্লবী এবং প্রথম গ্রেপ্তার বরণ করলেন ১৯৪১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে।

ইতিমধ্যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দেশজোড়া বিক্ষোভের মাঝে আউং সান চেষ্টা চালাচ্ছিলেন জাপানি সরকারের সাথে যোগাযোগ করার। জাপানিরা বর্মার নেতাদের সাহায্যের আশ্বাসবাণী শোনায়। অমর নাগ তখন ইনসিন জেলে বন্দী। প্রথমে সকলকেই সেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল কিন্তু বন্দী কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ ও সদস্যেরা যখন জেলকমিটি গড়ে তোলেন ও জেলের ভেতর থেকেই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হন

তখন প্রমাদ গোনে ব্রিটিশ শাসক, তাঁরা বিভিন্ন জেলে বিপ্লবীদের হস্তান্তরিত করতে থাকে। নিউইয়াং লোবিন জেলে পাঠানো হয় নাগকে। ততদিনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। ১৯৪১-এর শেষাশেষি জাপান আক্রমণ শানালো ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। পরের বছরই ইংরেজরা বর্মা ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করে। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বর্মার মানুষদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে আউং সান জাপানিদের সহায়তা চেয়েছিলেন, তাঁর আশা পূর্ণ হল। বর্মী জনসাধারণ স্বাগত জানালো জাপানিদের। যদিও দূরদর্শী নাগ ভালই বুঝতে পেরেছিলেন জাপানিদের আসল রূপ প্রকাশ পেতে দেরি হবে না এবং কমিউনিস্ট পার্টিসহ সমস্ত গনতন্ত্রপ্রিয় মানুষের ওপর অচিরেই নেমে আসবে জাপ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ। একঝাঁক বাঙালি তরুন তখন গোপনে দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা নিলেন যদিও সে ফিরে যাওয়া ছিল সাময়িক, আসল যুদ্ধ তখনও বাকি। জাপানিরা যখন রেঙ্গুন দখল করে অমর নাগ তখন কলকাতায়। তাঁর অন্য সহযোগীরা, হরিনারায়ণ ঘোষাল, অমর দে, সাধন ব্যানার্জীরাও জেল থেকে পালান। জাপ বোমাবর্ষণে জেল ভেঙ্গে গেছিল। আশ্চর্যজনকভাবে তাঁরা বেঁচে যান! এবং পুর্বল্লিখিত পথ ধরে তাঁরাও ফিরে আসেন ভারতে।

ডাঃ নাগ এদেশে ফিরে আরামে আয়েশে জীবন কাটাবার পরিবর্তে আত্মনিয়োগ করলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (অবিভক্ত) কাজে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী কবলিত বাংলায় ত্রান কমিটি গড়ে অগণিত চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রাণপুরুষ হয়ে ওঠেন তিনি। সাথী হিসেবে পান ডাঃ কোটনিসের সহকর্মী ডাঃ বিজয় কুমার বসুকে। বিধানচন্দ্র রায়ের পরিচালনায় গড়ে ওঠা Bengal Medical Relief Co-ordination Committee-এর ডাক্তার হিসেবে বিভিন্ন অঞ্চলে ক্যাম্প করে দিনের পর দিন কাজ চালিয়ে যান এই ক্লান্তিহীন বিপ্লবী। পার্টির অন্যতম শীর্ষনেতা রনেণ সেনের পরামর্শে ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পার্কসার্কাস সেকশনে সংগঠকের কাজ করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে '৪৬ এর দাঙ্গা প্রতিরোধে ট্রাম শ্রমিকদের অসামান্য বীরগাথা' শীর্ষক রচনায় সুবোধ ব্যানার্জী তার সাথী শ্রী নাগের নাম সশ্রদ্ধ চিত্তে উল্লেখ

করেছেন।

ওদিকে বার্মার রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত গতিপথ বদলায়। বাঙালী বিপ্লবীদের আশঙ্কা সত্যি হল। আউং সানের কাছে দেরীতে হলেও জাপানিদের সাম্রাজ্যবাদী চেহারা প্রকট হয়ে পড়ে এবং গোটা দেশজুড়ে নয়া বিদেশী হানাদারদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দেয় মুক্তি আন্দোলন, ইতস্তত গেরিলা সংগ্রাম। ইংরেজ শৃঙ্খল থেকে রেহাই পেয়ে জাপানিদের ফ্যাসিস্ট শাসন কখনোই কাম্য ছিল না বর্মিজ জনগণের, তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির দেশজোড়া গণ অভ্যুত্থানের ডাকে সাড়া দিল। রেঙ্গুনের বুকে প্রকাশ্যে জাপানিদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন প্রধান জাতীয়তাবাদী নেতা আউং সান। ফলত সাম্রাজ্যবাদীদের ভাড়াটে ঘাতকবাহিনীর হাতে নিহত হতে হল তাঁকে কিছুকাল পরেই। ততদিনে অবশ্য যুদ্ধে জাপানের পরাজয় ঘটেছে।

১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতবর্ষের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে যুদ্ধপীড়িত বিপদসংকুল বার্মায় একে একে প্রবেশ করেছেন ডাঃ নাগ ও তাঁর সাথীরা, যে বর্মা হবে তাঁদের শেষ রণক্ষেত্র। যোগ দিয়েছেন Anti Fascist Liberation Front এ। আউং সানের মৃত্যুর পর কমিউনিস্ট পার্টির সংকটের দিনে তাঁদের এই প্রত্যাবর্তন নতুন করে আশা জাগালো সেদেশের হাজারো মুক্তিকামী মানুষের হৃদয়ে। ৪৮ সাল থেকে শুরু হল গোটা দেশজুড়ে গণ আন্দোলন। শাসকের দমনপীড়ন, জেল, গুপ্তহত্যা, বিচারের প্রহসনান্তে খুন, কিছুই আটকাতে পারেনি সেদিনের অকুতোভয় ফ্যাসিবিরোধী সৈনিকদের। মুক্তিফৌজের দখলে এল দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। রেঙ্গুন জেনারেল হাসপাতালের সুখের চাকরি ছেড়ে এক শহর থেকে অন্য শহর, গ্রাম-নগর, পাহাড় জঙ্গল বন্দর তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন পার্টির মেডিক্যাল বাহিনীর প্রধান তথা পলিটব্যুরো মেম্বার দুর্ধর্ষ বিপ্লবী অমর নাগ। জীবিত বা মৃত যার মাথার দাম শাসকের কাছে তখন অনেক। ইতিমধ্যেই বিপ্লবী সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ১৯৪৮-এর ৪ঠা এপ্রিল প্রোম শহর দখল করে

জেল ভেঙ্গে বন্দীদের বের করে এনেছেন সাধারণ মানুষ। রেঙ্গুন ছাড়া দেশের প্রায় সবকটি বন্দীশালা চুরমার হয়ে গেছে! গ্রামের কৃষকসভা ও গনমুক্তি কমিটি যৌথভাবে দখলিকৃত অঞ্চলগুলির শাসনভার তুলে নিয়েছিল সেই ক্রান্তিকালে!

তবে এ জয় ছিল সাময়িক। এরপরের ইতিহাস আশাভঙ্গের। বেদনার। এই গৌরবময় মুক্তিসংগ্রাম তথাকথিত সাফল্যের মুখ দেখেনি। শাসকের কূট চক্রান্ত, পাশাপাশি প্রবল দমননীতির সামনে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হল বিপ্লবী সরকার। পার্টির কৌশলগত ত্রুটিও কিছুটা দায়ী ছিল এই পরিণতির জন্য।

ডাঃ নাগ সহ যে পাঁচজন বাঙালী বিপ্লবী বার্মা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন তাঁরা আর কেউই ফিরে আসেননি ভারতবর্ষে। ১৯৬০ সালের মধ্যেই ডাঃ নাগের সব সাথীরা এঁকে এঁকে মৃত্যুবরণ করেছেন বর্মার মাটিতে। হরিনারায়ণ ঘোষালের মৃত্যু রহস্যাবৃত, অনেকেই মনে করেন দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে খুন হন তিনি। অমর দে মারা যান দুর্ঘটনায়, গোপাল মুন্সি ও সুবোধ মুখার্জি দুজনেই সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন। ফেরেননি অমর নাগও! হাল ছাড়েননি তিনি। একা কুম্ভের মতো লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন অ্যান্ট ফ্যাসিস্ট লিবারেশন ফ্রন্টের এই অদম্য যোদ্ধা। সাথীহারা হয়ে টানা আটটি বছর! শেষ পর্যন্ত ১৯৬৮-এর ৯ই নুভেম্বর বিপ্লবীদের গোপন ঘাঁটি সেনাবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়। সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হন অমর নাগ এবং যুদ্ধ শেষে বীরের মৃত্যু বরণ করেন।

তাঁর সংগ্রামী জীবনচর্যা প্রমাণ করে যে হাত মানুষের জীবন বাঁচাতে চিকিৎসা করতে পারে, প্রয়োজনে সেই হাত রাইফেলও তুলে নেয়। একজন সাধারণ ডাক্তার বৃহত্তর মানবসমাজের স্বার্থে জীবন দিয়ে লিখে যান অসামান্য জীবনেতিহাস।

তোমায় অনেকে জিগ্যেস করতো
তোমার দেশ কোথায়?
আর তুমি হেসে জবাব দিতে,

সেখানেই, যেখানে আমি বিপ্লবের লড়াইতে।
-চে হুই কান (ভিয়েতনামী কবি)

পন্ডিতেরা বলেন, আন্তর্জাতিকতাবাদী কমিউনিস্টদের নিজস্ব কোনো দেশ থাকে না। তাহলে ডাঃ নাগ ও তাঁর সাথীদের ক্ষেত্রেও এ কথাটি ভীষণভাবে প্রযোজ্য। পৃথিবীর যেখানে যে প্রান্তে নিপীড়িত মানুষের কান্না আর দীর্ঘশ্বাস গুমরে মরে সেখানেই তাঁরা ছুটে যান, সেটাই হয়ে ওঠে তাঁদের মহান মাতৃভূমি। সাত্রের ভাষায় "মাতৃভূমি তাঁকে পরিত্যাগ করে না, যেখানেই সে যায়, যেখানেই তাঁর অবস্থান, সেখানেই মাতৃভূমি। মাতৃভূমি তাঁকে অনুসরণ করে কারণ তাঁর মুক্তি ও মাতৃভূমি অভিন্ন। এক।"

"The Nation does not shrink from him, wherever he goes, wherever he may be she is.... she follows, and is never lost to view for she is one with his Liberty"

বিশিষ্ট বামপন্থী চিন্তাবিদ ও প্রাবন্ধিক গৌতম চট্টোপাধ্যায় চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন এই বিপ্লবীদের সম্পর্কে-

"কৃতী ছাত্র, আরামের জীবন ছেড়ে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন বর্মার গরীব কৃষকের স্বার্থকেই নিজেদের স্বার্থ বলে। ২০ বছর ধরে তাঁদের ঘরবাড়ি ছিল বর্মার জঙ্গলে, বর্মার পাহাড়। রাজনীতির ভুলভ্রান্তি যাই হোক মুহূর্তের জন্যেও তাঁরা বর্মার মেহনতি জনতার সঙ্গে বেইমানি করেননি এবং শেষ পর্যন্ত বরণ করেছেন শহীদের মৃত্যু।"

ব্রহ্মদেশ তাঁকে মনে রেখেছে কিনা আমাদের জানা নেই অন্তত এদেশের ঠাণ্ডা ঘরে বসা কমিউনিস্টরা (!) বা হালফিলের সখের বিপ্লবীরা যে ডাঃ নাগের জীবনাদর্শে বিন্দুমাত্র প্রাণিত হননি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সেই দেশ বড়ো দুর্ভাগা যে দেশে কোনো বীর নেই।
সেই দেশেও দুর্ভাগা যেখানে কেবলই বীরের প্রয়োজন হয়!
কিন্তু সেই দেশে সবচেয়ে দুর্ভাগা নয় কি যে দেশে বীরদের ক্রমাগত

ভুলে যায় দেশবাসী?

কারা ভুলে যাবে আর কারাই বা মনে রাখবে সে ভবিষ্যত চিন্তা করে অমর নাগের মতো সর্বস্বত্যাগী যোদ্ধা রণভূমিতে পদার্পণ করেন না। তাঁদের প্রানের বিনিময়ে প্রাপ্ত সুফল পরবর্তী প্রজন্ম ভোগ করে। মানুষের মৃত্যু ঘটে, বেঁচে থাকে আদর্শ। শহীদের অপাপবিদ্ধ অস্থি দিয়ে তৈরি হয় অস্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে ভাবীকালের বিপ্লবীদের হাতের আয়ুধ।

পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি দেশে, প্রত্যেকটি পরাধীন মানুষের মুক্তি না হওয়া অবধি অমর নাগদের পথ চলা ফুরোয় না। তাঁরা অসীম দুঃসাহসের রাষ্ট্রশক্তিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। শাসকের রক্তচক্ষু, শোষকের বাহুবল তাঁকে ভয় দেখাতে পারে না। ঘাতকের বুলেট, ফাঁসির দড়ি, গ্যাস চেম্বার তাঁকে শেষ করতে পারে না কারণ তাঁর মরণের ভারে হার মানে স্বয়ং পাহাড় হিমালয়।

তাঁর খোলা চোখে এলো আস্তে আস্তে ভোরের আকাশ
সেই চোখে চোখে রাখে এত সাধ্য ছিল না খুনির
ও যেখানে শুয়ে আছে সেখানেই জয়ের সম্মান
সেখানেই সূর্য ওঠে, সেখানেই জেগে থাকে ধান।
--রাম বসু

অপ্রচলিত -
অক্টোবর, ২০১৩

প্রমিথিউসের পথে ডাঃ দাভলকর

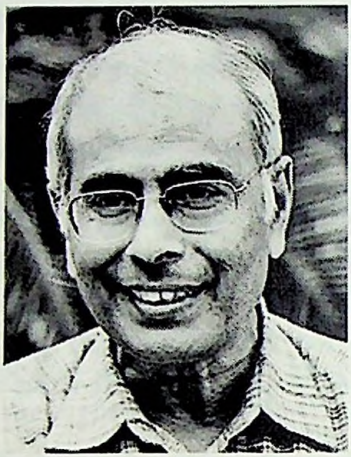

মানুষের মুক্তির জন্য যারা অস্ত্র ধরেন তাঁরা বিপ্লবী, তাঁরা যোদ্ধা। চিন্তার মুক্তির জন্য যারা পথে নামেন, তুলে নেন শানিত কলম তাঁরাও যোদ্ধা। যুক্তি, জ্ঞান ও মুক্তিচিন্তার প্রসার ঘটাতে তাদেরও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, জাতপাত, বর্ণবিদ্বেষ, অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে অহরহ লড়াই চালাতে হয়। বাজী রাখতে হয় জীবন। এমনই এক যোদ্ধা ছিলেন ডাঃ নরেন্দ্র দাভলকর। যাকে ২০১৩ সালের ২০শে অগাস্ট গুলি করে হত্যা করল ভাড়াটে বন্দুকবাজেরা।

নরেন্দ্র দাভলকরের জন্ম ১৯৪৫ সালের ১লা নভেম্বর। দাদা দেবদত্ত দাভলকর ছিলেন সমাজকর্মী ও শিক্ষাবিদ, তাঁর প্রভাব পড়েছিলেন নরেন্দ্রর ওপর। সাতারার নিউ ইংলিশ স্কুল থেকে পড়াশোনা শেষ করে ভর্তি হন মিরাজ মেডিক্যাল কলেজে। কৃতিত্বের সাথে ডাক্তারি পাশ করেন। ছাত্রবস্থায় পড়াশোনা ছাড়াও ভালো অ্যাথলিট হিসেবে সুনাম ছিল। জাতীয় কবাডি দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। এজন্য মহারাষ্ট্র সরকার তাঁকে

শিবছত্রপতি যুব পুরস্কারে সম্মানিত করে।

ডাঃ দাভলকর পেশাগতভাবে টানা একযুগ ডাক্তারির সাথে যুক্ত থাকলেও তাঁর মূল জেহাদ ছিল সমাজের কুসংস্কার, ভণ্ডবাবা ও অলৌকিকতার বিরুদ্ধে! যুক্তিবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়েছিলেন আশির দশকের প্রথম দিকে। ১৯৮৯ সালে ভারতীয় অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূল কমিটির মহারাষ্ট্র শাখা গড়ে তোলার প্রধান কুশীবল তিনি। যে সংগঠন বুজরুক তান্ত্রিক ও স্বার্থান্বেষী ধর্মীয় নেতাদের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম চালিয়ে গেছে ও আজো চালাচ্ছে। মহারাষ্ট্রের বুকে তার ১৮০ টি শাখা বিদ্যমান।

দাভলকরের স্বপ্ন ছিল তার প্রস্তাবিত কুসংস্কার বিরোধী বিলকে আইনে বাস্তবায়িত করা যা তাঁর জীবদ্দশায় হতে দেয়নি বিজেপি ও শিবসেনা গোষ্ঠী, 'হিন্দু বিরোধীতা'র ধুয়ো তুলে।

একদিন চার্বাক দর্শনের জনপ্রিয়তা ও সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে তার জোরালো কণ্ঠে শঙ্কিত হয়েছিল শাসক ও রাজন্যপুষ্ট পুরোহিতবর্গ। যুক্তিবাদী পুঁথিপত্রের বহুৎসব ঘটেছিল সেদিন। শ্রেণীনিপীড়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার ধর্মকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকা এইসব ঠকবাজ পরজীবীরা চিরকালই মদত দেয় কর্মফল-জন্মান্তবার-আত্মা প্রেতাত্মার অলৌকিক কাণ্ডকারখানাকে। এর বিরুদ্ধে যে বা যারাই রুখে দাঁড়ায় তাঁদের 'গণশত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যুগে যুগে। ইবসেনের নায়ক ডাঃ স্টকম্যানের মতোই প্রতিবাদ করেছিলেন দাভলকর। এককথায় ভূত-ভগবানের নামে শয়তানের কারবারকে ভাঙতে চেয়েছিলেন তিনি ও তাঁর সাথীরা। তাঁর খসড়া করা তন্ত্রমন্ত্র, তুকতাক ও অলৌকিক পদ্ধতিতে রোগ সারাবার বিরুদ্ধে যে বিলটি (Anti Black Magic Bill) বারংবার মন্ত্রীসভায় আলোচিত হয়েছে তা পুরোপুরি পাস হলে একশ্রেণীর অসাধু ধর্ম ব্যবসায়ীদের স্বার্থে আঘাত করবে বলাই বাহুল্য। তাঁরা বহুবার হুমকি দিয়েছে দাভলকরকে। ১৯৮৩ সাল থেকেই তাঁকে শারীরিক ও মানসিক নানা আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে। দমেননি অকুতোভয় এই বিজ্ঞানকর্মী। এমনকি নিজের দেহরক্ষীর

সুবিধাও তিনি প্রত্যাখান করেছিলেন এই বলে যে "If I have to take police protection in my own country from my own people, then there is something wrong with me, I am fighting within the framework of The Indian Constitution and it is not against anyone but for everyone."

বিজ্ঞান আন্দোলনের পাশাপাশি সামাজিক এবং অন্যান্য প্রগতিশীল কর্মযজ্ঞের প্রথম সারির সৈনিক তিনি। মহারাষ্ট্রের বুকে প্রায় কয়েক হাজার কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান, জনসভা, সেমিনার করে তথাকথিত গডম্যানদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। জ্যোতিষী ও ভবিষ্যত বক্তারা বারবার তাঁর চ্যালেঞ্জের কাছে পর্যদুস্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে দাভলকরের সাথী ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানী জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার। দলিতদের অধিকারের দাবী ও অস্পৃশ্যতা-জাতপাত বিরোধী সংগ্রামের শরিক হিসেবে মারাঠাওয়াড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বাবাসাহেব আম্বেদকরের নামে পরিবর্তিত করার উদ্যোগে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রচুর বই লিখেছেন, সাতারা জেলার প্রান্তিক পিছড়েবর্গের মানুষদের অধিকার সচেতনতায় লড়াকু সংগঠন 'পরিবর্তন' তারই হাতে তৈরী। ভারতীয় যুক্তিবাদী সংগঠনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, সম্পাদনা করেছেন প্রখ্যাত গান্ধিবাদী সানে গুরুজীর প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাধনা'।

ডাঃ দাভলকরের সাহসী কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল ক্ষমতাশালী ধর্মগুরু আশারাম বাপুর (বর্তমান যৌন কেলেঙ্কারী ও ধর্ষিতার সম্পর্কে ন্যক্কারজনক মন্তব্যে কুখ্যাত!) অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। ২০১৩-এর মার্চে নাগপুরে হোলি খেলার নামে এই ভণ্ড সাধু পৌরসভার পানীয় জলের ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে স্ফূর্তি শুরু করে। প্রায় ৫০ হাজার লিটার পানীয় জল নষ্ট হয়! দাভলকর এবং তাঁর সাথীরা প্রথম প্রতিবাদ জানান এই ঘটনায়, পৌরসভা বাধ্য হয় ব্যবস্থা নিতে। এ থেকে বোঝাই যায় যে তাঁর শত্রুসংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশের আড়ালে যেসব ধর্মীয় মাফিয়াদের সন্তুষ্ট করে, তাদেরই সাহায্যে জনবিরোধী কাজকর্ম

চালায় তাঁরা খুব স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিতে পারেনি ডাঃ দাভলকরকে। তাই তাঁকে প্রাণ দিতে হল।

হত্যার দিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন দাভলকর। সকাল ৭:২০ নাগাদ দুই বন্দুকধারী খুব কাছ থেকে পরপর চার রাউন্ড গুলি চালিয়ে খুন করে তাঁকে। পুনে ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের সামনে পড়ে থাকে মহান বিজ্ঞানকর্মীর লাশ! এরপর গোটা রাজ্যজুড়ে বিজ্ঞানকর্মীরা, অসংখ্য সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামেন, স্বতঃস্ফূর্ত বনধ পালিত হয়। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রগতিশীল ও বিজ্ঞান সংগঠনগুলি তীব্র ধিক্কার জানায়। মৃত্যুর পরেই তড়িঘড়ি করে সব রাজনৈতিক দলগুলি শোকবার্তা পাঠিয়ে দেয়। মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চৌহান ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কারই ঘোষণা করে ফেলেন খুনির সন্ধানে! যদিও সনাতন সংস্থা নামে একটি হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনের সদস্যকে পুলিশ সন্দেহবশতঃ গ্রেপ্তার করলে শিবসেনাপ্রধান উদ্ধব ঠাকরে নির্লজ্জভাবে ধমকি দিতেও থামেনি! দাভলকর স্মরণে পুনে ফিল্ম ইন্সটিটিউট পরিচালিত অনুষ্ঠান বানচাল করে দেয় A.B.V.P-এর গুন্ডাবাহিনী। আরো মজার ব্যাপার যে বিলটি দাভলকর নিজের জীবদ্দশায় অক্লান্ত প্রচেষ্টাতেও পাশ করাতে পারেনি সেটিও অর্ডিন্যান্স আকারে পাশ করানো হল পরের দিন! এ সবই ছিল ড্যামেজ কন্ট্রোলের চিরাচরিত ব্যাবস্থা।

দাভলকরের মতো ধর্মদ্রোহী মানুষের শেষজীবন অনেকক্ষেত্রেই খুব মর্মান্তিক, বেদনাদায়ক। ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে তাঁর ভুরি ভুরি উদাহরন মিলবে।

অ্যানাক্সাগোরাস (খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৫০০-৪২৮)-কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন এথেন্সবাসীরা ধর্মদ্রোহী বলে চিহ্নিত করে, তাঁকে নির্বাসিত করা হয়। যতদূর জানা গেছে ধর্মবিরুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচারের জন্য এটিই প্রথম লিপিবদ্ধ নির্যাতন।

কোপার্নিকাসের De Revolutionibus নিষিদ্ধ হলো।

গ্যালিলিও নিক্ষিপ্ত হলেন জেলে, অন্ধ হয়ে গেলেন এই মহান জ্ঞানতপস্বী।

আলেকজান্দ্রিয়ার অসামান্য গণিতজ্ঞা বিদুষী নারী হাইপেশিয়াকে নির্মমভাবে পুড়িয়ে হত্যা করে একদল পাদরী। রোমকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যারিস্টাকার্সের সূর্যকেন্দ্রীক পরিকল্পনা মানেনি যাজক সম্প্রদায়, তাঁকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।

দীর্ঘ সাতবছর অত্যাচার ও বিচারের প্রহসনান্তে জিওরদানো ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারল ইনকুইজিশন। দুঃসাহসী ব্রুনো নিজের পথ থেকে সরে আসেননি। মাথা নোয়াননি। বিজ্ঞান মাথা নোয়ায় না অপবিজ্ঞানের সামনে। শাসকের মদতপুষ্ট ধর্মধ্বজাধারীরা যতই ক্ষমতাবান হোক না কেন পৃথিবী তবুও ঘোরে। ঘুরবেও।

প্রমিথিউস ছিলেন বিদ্রোহী। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আগুন নিয়ে এসেছিলেন মানুষের কাছে, মানুষের জন্য। ধর্মান্ধতার উর্ণজাল ছিন্ন করে যারা যুগে যুগে আলোর মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে হেঁটেছেন তাঁদের হাতে ছিল প্রমিথিউস প্রদত্ত সেই অগ্নিশিখা, বিজ্ঞানের বিজয় বৈজয়ন্তী। কোনো ইনকিউজিশন, বন্দীশালা, লঞ্ছনা অপমান তাঁকে নেভাতে সক্ষম হয় না। এখানেই যুক্তিবাদের জয় আর এখানেই জিতে গেছেন চেতনার দাসত্বের বিরুদ্ধে আমৃত্যু যুদ্ধ করে চলা ডাক্তার নরেন্দ্র অচ্যুত দাভলকর। তাঁর প্রাণ কেড়ে নিল ঘাতকের বুলেট তবু মরেও বেঁচে রইলেন তিনি। সেই অনির্বাণ অগ্নিশিখার মতো।

মানবী এখন, নভেম্বর' ১৩

শহীদ বিষ্টু ঠাকুর : এক দুরন্ত অগ্নিঝড়

একএকটা মুহূর্ত আসে যা তৈরি করে ইতিহাস
এমনও মৃত্যু আসে যা জীবনকে করে মৃত্যুঞ্জয়ী
এমন কিছু কিছু শব্দ সৃষ্টি হয় যা কোনো স্তবগানের চেয়েও মহত্তের
এমনও মানুষ আছেন যারা ঘোষণা করেন নতুনের জন্মবার্তা।
-তোহু(ভিয়েতনামীকবি)

বিশ্ব ইতিহাস সৃষ্টির চালিকাশক্তি কেবলমাত্র জনগণ। তারাই বিপ্লবীযুদ্ধের জয় পরাজয়ের নির্ধারক উপাদান, কোনো মানুষ একা ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারেন না, ইতিহাসকে প্রভাবিত করেন মাত্র। কিন্তু তাঁর চিন্তাশীলতা, ত্যাগ এবং জনগণের লড়াইয়ে বৈপ্লবিক অবদান তাকে ইতিহাস পুরুষের মর্যাদা দান করে! তিনি হয়ে ওঠেন মৃত্যুঞ্জয়ী। এমনই একজন মানুষ ছিলেন বিষ্টু ঠাকুর। বাংলার কৃষক আন্দোলনের কিংবদন্তী মহানায়ক। যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন মেহনতি জনতার স্বার্থে।

বিষ্টু ঠাকুরের জন্ম ১৯১০ সালের এপ্রিল মাসে খুলনার খানকা গ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে। আসল নাম বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়। বাল্যকাল কেটেছে

মাতুলালয়ে, ডুমুরিয়া থানার সাহস গ্রামে। ছোটবেলা থেকেই বোহেমিয়ান বিষ্ণু নৈহাটি (পূর্ব বাংলার) স্কুলে পড়ার সময় সাধুসংগের ঝোঁকে বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান! বেশ কিছুকাল সন্ন্যাস জীবন যাপন করবার পর সে পথে আগ্রহ হারিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। উচ্চ সামন্ত বংশের ছেলে হলেও ভাইবোনেদের অনেকেই গোপনে ব্রিটিশবিরোধী সংগঠনের সাথে অল্পবিস্তর যুক্ত ছিলেন। তাঁর এক ভাই নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও বোন ভানুদেবী ইংরেজ বিরোধীতার জন্য কারারুদ্ধ হয়েছেন, নির্যাতিত হতে হয়েছে তাঁদের। এর প্রভাব পড়েছিল বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়ের ওপর।

যশোর-খুলনা এলাকায় জাতীয় বিপ্লববাদী কার্যকলাপ বিশের দশকের প্রথম ভাগেই মাথাচাড়া দিয়েছিল। যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতি উভয় দলের প্রভাবে সেখানকার তরুন বিপ্লবীরা 'যশোর-খুলনা যুবসংঘ' (Jessore-Khulna Youngman's Association) নামে একটি স্বতন্ত্র বিপ্লবী গোষ্ঠী গড়ে তোলেন ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে। এর সাথে জরিত হয় পড়েন বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়। পুলিশ একে কমিউনিস্ট-টেররিস্ট গ্রুপ বলে অভিহিত করে। এই সংগঠন জনকল্যাণমুলক কাজকর্মের আড়ালে অস্ত্র এবং অর্থসংগ্রহ করতো কারণ রাজনৈতিক ডাকাতি ও সশস্ত্র বিপ্লববাদী কাজের মাধ্যমে ইংরেজ বিতাড়ন ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য। কমিউনিস্ট পারটিতে যোগদান করবার আগে পর্যন্ত বিষ্ণু ছিলেন এই গুপ্তসমিতির সর্বক্ষণের কর্মী, থাকতেন খালিশপুরে স্বরাজ আশ্রমে যেখানে কৃষিকাজ, শরীরচর্চা, পঠন পাঠন ইত্যাদি সামাজিক কাজের অছিলায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র অভুথ্যানের প্রস্তুতি চলত! যদিও পরবর্তীতে ভবানী সেন, শচীন মিত্র প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতৃবর্গের প্রভাবে 'রাজনৈতিক ডাকাতি'র পথ পরিত্যাগ করে সসস্যর সমাজতান্ত্রিক চিন্তার আলোকে মার্কসবাদী চক্র গড়ে তোলার দিকে এগিয়ে যান। স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে গণসংযোগ গড়ে তোলার মূল স্থপিত ছিলেন তরুন বিষ্ণু। তিনি ও তাঁর সাথীরা নিজেরাই কৃষিকাজে হাত লাগান, উদ্বৃত্ত ফসলের অংশ হাটে বিক্রি করার পাশাপাশি স্থানীয় শ্রমজীবী মানুষকে রাজনীতি সচেতন করতে থাকেন। তাঁর নেতৃত্বে সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী পাইকগাছা অঞ্চলে

প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষদের জন্য সাক্ষরতা কর্মসূচী নেওয়া হয়।

১৯২৯ সালের গোড়ায় মিথ্যা ডাকাতির মামলা দিয়ে পুলিশ বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়কে, প্রথম ভৌমিক ও যুবসংঘের অন্যান্য কর্মীদের সাথে গ্রেপ্তার করে। কিছুকাল পড়ে প্রমাণাভাবে মুক্তি পেলেও আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবার জন্য পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৩০ এর ২রা মে, Bengal Criminal Law(Amendment) Act, 1930-এ বন্দী করে। বন্দী হন তাঁর ভাই নারায়ণও। জেলে থাকাকালীন তিনি বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা আব্দুর রেজ্জাক খাঁর সাহচর্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে প্রাণিত হন, ১৯৩৭ সালে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকার শর্তে মুক্তি পেয়ে মার্কসবাদের প্রতি অবিচল আস্থা নিয়ে যোগ দেন কমিউনিস্ট পারটিতে। খুলনা জেলাকমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করতে থাকেন গ্রামাঞ্চলে।

৪০-এর দশক থেকে যশোর-খুলনা সাথক্ষীরা শোভনা এলাকায় তেভাগার দাবিতে বর্গাদার ও সাধারণ ভাগচাষীরা তিব্র আন্দোলন শুরু করেন। পুরোভাগে ছিলেন কমঃ বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়। স্বতঃস্ফূর্ত এই আন্দোলনকে সাংগঠনিক রুপ দেওয়ার জন্য বিরামহীনভাবে জেলার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত ছুটে চললেন তিনি। 'জান দেব তবু ধান দেব না' শ্লোগান আক্ষরিক অর্থেই বাস্তবে পরিণত হয়েছিল সেদিন।

ডুমুরিয়া থানা এলাকার বিপুল সংখ্যক খেতমজুর, ভাগচাষী, মাঝারি কৃষক সকলেই তেভাগার উত্তাল আহ্বানে হিন্দু-মুসলমান ভেদনীতিকে চূর্ণ করে কমঃ বিষ্ণুর সাথে যোগ দিলেন। তিব্র জঙ্গী আন্দোলন আতঙ্কিত করে তুলল শাসকশ্রেণীকে। পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন হাজারীপদ মণ্ডল। কয়েক হাজার কৃষক একত্রিত হয়ে বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শোভনার 'সিখাবাহী নদী'র বাঁধ ও 'নবেকী'র বাঁধ বেঁধে দিলো বন্দুকধারী পুলিশ ও জমিদারের ভাড়াটে গুন্দাবাহিনীর সামনেই। জমিদারেরা বহুকাল ধরে দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাদের সাহায্যে চাসজমিতে নোনাজল ঢুকিয়ে ভাতে মারার ব্যাবস্থা করত কৃষকদের, এই বর্বর প্রথা রুখে দিয়ে স্থানীয় শ্রমজীবী জনতার

চোখের মণি হয়ে উঠলেন তিনি, দৈনন্দিন সংগ্রামে সুখদুঃখের সাথী। ২১ হাজার বিঘা জমি দখল করে ভূমিহীনদের বিলি করলেন! ততদিনে বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় হয়ে উঠেছেন বিষ্টু ঠাকুর! জেলা জুড়ে প্রচার হয়ে গেল 'বিষ্টু ঠাকুরের আইন' চালু হয়েছে! চাষিদের আর কোনো ভয় নেই। তাঁর অভূতপূর্ব সাংগঠনিক ক্ষমতা, সাহস, কিংবদন্তীর আকারে ছড়িয়ে পড়লো সাধারণ মানুষের ভিতরে। পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে পালানো, কুমীর কামঠ ভর্তি ভদ্রা নদী পার হয়ে যাওয়া, দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল ও জোতদারদের ভাড়াটে বাহিনীর সামনাসামনি মোকাবিলা ইত্যাদি ঘটনায় সরলপ্রাণ কৃষকের ধারণা হল বিষ্টু ঠাকুর জাদু জানুন! তাকে ধরবার সাধ্য পুলিশের নেই, গুলি তাঁর গায়ে লাগে না, ইচ্ছে করলে হাওয়ায় মিশে যান, তিনি অমর, অক্ষয়, অব্যয়! যে বাঁধের ওপর দিয়ে এই মানুষটি হেঁটে যান তা ভাঙ্গে সাধ্য কার? অপরিসীম ভালোবাসা, বিশ্বাস আর জনগণের সাথে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা থাকলে তবেই এই উচ্চতায় পৌছানো যায়! বিষ্টু ঠাকুরের সে গুণাবলী ছিল যা একজন কমিউনিস্ট বিপ্লবীর প্রধান সম্পদ।

তেভাগার অন্যতম নেতা কৃষ্ণবিনোদ রায়ের ভাষায় "কর্মবীর বিষ্টু চট্টোপাধ্যায় কৃষকদের যেই ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন সংঘাতের পর সংঘাতে তা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হল, ক্ষুদ্র এলাকায় যা ব্যপ্ত ছিল তা প্রসারিত হল আরো বড়ো আয়তন জুড়ে.....লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই কৃষকদের একতাবদ্ধ সংগ্রাম তাঁর নেতৃত্বে গোটা ডুমুরিয়া, সাহস ও বতেঘাটায় ছড়িয়ে পড়লো। বিষ্টুদার ডাক আসতে থাকলো প্রতি থানা, প্রতি এলাকা থেকে। সেদিন বিষ্টু চট্টোপাধ্যায়কে যাদুকর মনে হয়েছিল।"

১৯৩১ ও ১৯৪৪ সালে দুটি জেলা কৃষক সম্মেলন সফল করার প্রধান কারিগর ছিলেন তিনি তারই উদ্যগে মৌভাগ এলাকায় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬-এ বহুবার বন্দী হয়েছেন, বিনা বিচারে জেল হয়েছে, নিগৃহীত হয়েছেন। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও অত্যাচারকে প্রায় মুছে ফেলেছিলেন এই অসমসাহসী যোদ্ধা! অভিজাত

বংশগৌরবকে পায়ে দলে মিশে গিয়েছেন লড়াকু জনতার মাঝে, তাদেরই একজন হয়ে। জনগণের কাছ থেকে শিখেছেন আবার তাদেরই বিলিয়ে দিয়েছেন। মানুষের ভালোবাসা বীর বিরসা মুণ্ডাকে যেমন 'ভগবান'-এর আসনে বসিয়েছিলেন তেমনই বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় হয়ে গিয়েছিলেন 'ঠাকুর'।

দীর্ঘ জেলজীবন তাঁর শরীরকে ভেঙ্গে দিয়েছিল, গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় জেল থেকে মুক্তি পান। এরপর বিজ্ঞানসম্মত চাষের কৌশল, বিভিন্ন ফসল কিভাবে আরো উন্নত আকারে উৎপন্ন করা যায় সে নিয়ে গবেষণা করেছেন। শিখেছিলেন গাছে কলম বাঁধার বহু উপায়, আধুনিক পদ্ধতিতে মাছচাষ, পশুচিকিৎসা। ভেষজ গাছগাছড়া, কুটিরশিল্প ইত্যাদি নিয়েছিল গভীর আগ্রহ। একজন অভিজ্ঞ চাষীর মতোই জানতেন মাটির প্রকৃতি, সারের ব্যবহার, ফসলের গুণাগুণ! বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিষ্টু ঠাকুর পারদর্শী ছিলেন এস্রাজ বাজানোতে, 'মেহনতি মানুষ' নাম দিয়ে তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়। কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় কিছু ছোটো গল্প লিখেছেন। যাদের জন্য সারাটা জীবন উৎসর্গ করেছেন সেই গরীব কৃষকদের জন্য স্কুল, বয়স্কদের নৈশ বিদ্যালয়, বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদের পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন তিনি।

এই সর্বস্ব ত্যাগী মহান কমিউনিস্ট বিপ্লবীর শেষজীবন বড়ই মর্মান্তিক! বেদনার। দেশভাগের পর একে একে তাঁর অনেক সাথীই দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন ভারতবর্ষের নিরাপদ আশ্রয়ে, আসেননি তিনি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে শুরু করে দেশি শাসকদের বিরুদ্ধে সাহসী যোদ্ধা, আজীবন বিপ্লবী স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে চুপ করে থাকেননি। শেষ পর্যন্ত ১৯৭১-এর ১১ই এপ্রিল, নির্জন দুপুরে ইয়াহিয়া খানের প্রতিক্রিয়াশীল ঘাতকবাহিনী চে গেভারা সদৃশ এই মানুষটিকে নির্মমভাবে হত্যা করে! অবিভক্ত বাংলার লাখো লাখো শ্রমজীবী জনতার প্রিয় বিষ্টু ঠাকুরের জীবন দীপ নিভে গেল এভাবেই! "Entire section of the world history have no other existence than what the oppressor permitted us to know of them."-ঐতিহাসিক জ্যাঁ শ্যেনোস (Jean Chesnequx)

ভারতবর্ষের কৃষক জনসাধারণের ইতিহাস, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। বেশিরভাগ ঐতিহাসিকেরাই এই গৌরবোজ্জল অধ্যায়টিকে চাতুর্যের সাথে এড়িয়ে গেছেন, অবহেলা করেছেন। একইভাবে অবহেলিত, বিস্মৃত হয়েছেন কমঃ বিষ্টু ঠাকুর। নিজেও প্রচারবিমুখ ছিলেন তাই জীবদ্দশায় তাঁর নাম বাংলার তথাকথিত বিপ্লবী-বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচার পায়নি।

মূর্তি, রাস্তা, ফলক না থাকলেও, পুরস্কার, মানপত্র, ভাতা কিচ্ছুটি না জুটলেও মহান মানুষ চিরকালই মহান থাকেন। কৃষ কবীর বিষ্টু ঠাকুর জনতার কাছে এসেছিলেনএক দুরন্ত অগ্নিঝড়ের ন্যায়। ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন ও অত্যাচারের সময়, লড়াইয়ের চড়াই-উৎরাইয়ে, জয় পরাজয়ে, প্রতিটি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন সেনাপতির ভুমিকায়, কখনও তাঁদের পরিত্যাগ করেননি। জীবনের ২৪টা বছর কাটিয়েছেন পাকিস্তানের কারাগারে! সেই সংগ্রামী অতীত ভাঙ্গিয়ে নেমে পড়েননি ব্যাবসায়, তাঁর ও আরো অনেক সাথীদের মতো! ফ্যাশনচল বিপ্লবী বা শৌখিন কমিউনিস্টদের ন্যায় 'ঘোড়ার পিঠে চড়ে ফুলের শোভা' দেখেননি তিনি বরং শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আয়ত্ত করেছেন মার্কসবাদ। যা রুপ নিয়েছিল জীবন সত্যে।

লেনিন বলেছিলেন,"একজন বিপ্লবী হওয়া বা সমাজতন্ত্রের ভক্ত হওয়া অথবা সাধারনভাবে কমিউনিস্ট হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, প্রতিটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে তাকে সক্ষম হতে হবে শৃঙ্খল-মালার মধ্যে নির্দিষ্ট যোগসূত্রটি খুঁজে বার করতে, সর্বশক্তি দিয়ে তাকে আত্মস্থ করতে যাতে করে সমগ্র শৃঙ্খল-মালাটিকে ধরে রাখা যায় এবং দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুত হওয়া যায় পরবর্তী যোগসূত্রে উত্তরণ ঘটাবার জন্য"।

সন্দেহ নেই কমঃ বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেই বিরল কমিউনিস্টদের প্রতিচ্ছবি।

ঔপনিবেশিক ভারত দেখেছিল অসংখ্য শ্রমিক কৃষক বিদ্রোহ, অজস্র গণ অভ্যুত্থান। যার আগুন আজও নেভেনি, নেভার কথাও নয় কারণ

শাসকের বিরুদ্ধে শাসিতের যে লড়াই তাঁর নিবৃত্তি ঘটে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পরই। একটি আপাত ব্যর্থ বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দেয় নতুন বিদ্রোহের আগুন এবং মানুষ স্বপ্ন দেখে।

রক্তিম ভোরের স্বপ্ন দেখেছিলেন কমঃ বিষ্টু ঠাকুর। হয়ত কোনো একদিন, সেই স্বপ্নের ভোরে আগামীদিনের শৈশব পাঠক রবে মুক্তির মহাকাব্য, যেখানে থাকবে না হারেমবাসী সুলতান, অত্যাচারী রাজা কিংবা চাটুকার, বিশ্বাসঘাতকদের জীবনকথা। থাকবে লাখো লাখো নামহিন বিপ্লবী জনতার ত্যাগ ও আত্মবলিদানের ইতিহাস। গরম রক্তের প্রবাহের ভেতর সামান্য মানুষের অসামান্য জীবনেতিহাস। সেখানে নিশ্চয় লেখা থাকবে এই মহানায়কের জীবনকাহিনী।

অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন (সুচনাপর্ব)-অমিতাভচন্দ্র
বাংলার তেভাগা, তেভাগার সংগ্রাম-জয়ন্ত ভট্টাচার্য
সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, প্রথম খণ্ড।

(আবাদভুমি পৌষপার্বণ সংখ্যা ১৪২০)

আজি হতে শতবর্ষ আগে.....

"উপনিবেশে বেশ কয়েকটি বিদ্রোহের চেষ্টা ঘটেছে যেগুলি উৎপীড়ক দেশগুলি স্বভাবতই যথাসাধ্য গোপন রাখার চেষ্টা করেছে সামরিক সেন্সর ব্যবস্থার সাহায্যে। তবুও এটা জানা গেছে যে সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশরা নৃশংসভাবে দমন করেছে ভারতীয় সিপাহীদের একটি বিদ্রোহ"।লিখছেন লেনিন, সুদূর সুইজারল্যান্ডে বসে, বিদ্রোহের পরের বছর। অর্থাৎ ১৯১৬ সালের জুলাই মাসে।

সামরিক আদালতের বিচারে মোট ১৩৬ জনের মধ্যে ৩৭ জনকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়। বাকিদের বেশীরভাগই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে। কিরকম ছিলো এই বিদ্রোহের দমনের চিত্র? বর্ণনা করেছেন এক প্রবাসী বাঙালী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর 'সে যুগের আগ্নেয়পথ' বইতে। "একপার্শ্বে উচ্চপদস্থ অফিসারগণ দাঁড়াইয়ে অপেক্ষা করিতেছেন। ইহার পরেই অপরাধীগণ আসিল। শুনিলাম ইহারা সকলেই এন-সি-ও এবং ভি-সি-ও অর্থাৎ সুবেদার মেজর, সুবেদার এবং হাবিলদার শ্রেণীর। দুই পার্শ্বে দুইজন করিয়া সৈন্য। প্রত্যেককে এক একটি খুঁটির সমমুখে দাঁড় করানো হইলো। প্রায় মধ্যস্থানে দেখিলাম বিশালাকায়, গৌরবর্ণ একটি পুরুষসিংহ (বিদ্রোহীদের নেতা সুবেদার মেজর ডাণ্ডি খান).....। গোরা সৈন্যগণ অপরাধীদের দিকে বন্দুক তাক করিল। অপরাধীগণও সোজা হইয়া দাঁড়াইলো। হুকুম পাঠ আরম্ভ হইলো। মালয়, উর্দু ও ইংরেজী ভাষায়। প্রত্যেক ভাষায় পাঠের পর ইংরেজীতে 'দাস জাস্টিস ইস ডান' বলা হইলো। হুকুম পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম হইলো... 'ফায়ার'। ১০টি রাইফেল একসঙ্গে গর্জিয়া উঠিল। সকলেই পড়িয়া গেল। কেবল ডাণ্ডি খান চক্ষুদুটি বিস্ফারিত করিয়া টলিতে থাকিলেন, যেন কিছুতেই পড়িতে চাহিতেছেন না। আবার হুকুম হইলো 'ফায়ার' এবারেও দুইবার গুলি চলিল, ডাণ্ডি খান অবশ্য প্রথম গুলিতেই পড়িয়া গেলেন। এই ডাণ্ডি খানও তো আমারই মতো স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার

সহকর্মীদের জীবনদান বৃথা যায় নাই। কেবল ভারতে কেহ জানিল না তাঁদের মহান ত্যাগের কথা"।

সেনাবিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী (!) - দের 'ন্যায়দণ্ড' প্রদানের খণ্ডিত চিত্র মাত্র। শতবর্ষ পার হয়ে গেল নীরবে। চূড়ান্ত অবহেলায়, অসম্মানে। হিন্দু-জার্মান কন্সপিরেসি নামে আখ্যা দিয়েছিলো সাহেবরা। যা ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলা, সবচেয়ে ব্যয়বহুল মামলা। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের ধারাবাহিক পরিকল্পনা, যার বীজ বুনে দিয়েছিলেন 'কোমাগাতামারু' জাহাজের স্বাধীনচেতা শিখ যাত্রীরা। প্রায় ৪০০ ভারতীয় যাত্রী নিয়ে কোমাগাতামারু বাবা গুরুজিৎ সিং-এর নেতৃত্বে ভ্যাঙ্কভারে পৌঁছায় ১৯১৪ সালের ২৩ মে। কানাডা সরকার জাহাজের যাত্রীদের (যাদের অধিকাংশই শিখ) বন্দরে নামতে দিতে অস্বীকার করে। কানাডার প্রবাসী ভারতীয়দের অনুরোধ এবং খাদ্য, পানীয় ফুরিয়ে আসা কোমাগাতামারুর যাত্রীদের অসহায়তাকে অস্বীকার করা কানাডা সরকারের বিরুদ্ধে যাত্রীদের ক্ষোভ ক্রমশ বিদ্রোহের আকার নিতে থাকলে বন্দর কর্তৃপক্ষ বিরাট পুলিশ বাহিনী পাঠায়। জাহাজের যাত্রীদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে কানাডা পুলিশ প্রাথমিকভাবে পলায়ন করলেও যুদ্ধ-জাহাজের আক্রমণের হুমকিতে 'কোমাগাতামারু' শেষ অবধি বন্দর পরিত্যাগ করে। গদর বিপ্লবীরা এই সুযোগ কাজে লাগান। তাঁদের প্রচার, মতাদর্শ, ব্রিটিশ বিরোধিতা স্বভাবতই প্রভাবিত করেছিলো শিখ যাত্রীদের।

শেষপর্যন্ত হংকং হয়ে জাহাজটি ২৭ সেপ্টেম্বর বজবজে এসে পৌঁছয়। ইংরেজ সরকারের পুলিশ জোরপূর্বক আরোহীদের পাঞ্জাবে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে সশস্ত্র শিখদের সাথে তুমুল খণ্ডযুদ্ধ হয়। সেনাবাহিনীর এবং আরোহীদের মধ্যে নিহত হন ১৮ জন। বহুলোককে বন্দী করা হয়। এই ছিল সূত্রপাত। 'গদর' আদর্শে অনুপ্রাণিত শিখদের ওপর পুলিশি হামলার সংবাদ দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়লো গোটা ভারতে। ইতস্তত জ্বলে উঠলো

বিদ্রোহের আগুন। ঐ একই বছর ২৭ অক্টোবর, তোসামারু, নামে অপর একটি জাহাজ কলকাতায় আসে যার আরোহীরা ছিলেন সকলই গদর সমিতির সদস্য। একই রকমভাবে তাদেরকেও আটক/নজরবন্দী করা হয়ে থাকে। নজরবন্দী অবস্থাতেও তাঁরা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে বিরতি দেননি।

১৯১৩ সালে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো 'গদর' পার্টির। গদর শব্দের অর্থ 'বিপ্লব'। ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ নামক সংগঠন আগেই ছিল। লালা হরদয়ালের দেওয়া নামে নতুন দল আত্মপ্রকাশ করে। যাদের মূলমন্ত্র ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা। মার্কিন সরকার হরদয়ালকে 'নৈরাজ্যবাদী' ঘোষণা করে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা শুরু করলে হরদয়াল চলে যান জার্মানী। যদিও বাকি সাথীরা - বিষ্ণুগণেশ পিংলে, সত্যেন সেন (তৎকালীন গদর পার্টির একমাত্র বাঙালী) বরকতুল্লাহরা দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রাথমিকভাবে তাদের কাজ ছিল প্রবাসী ভারতীয়দের বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত করা ও সশস্ত্র সংগ্রামের পথে নিয়ে আসা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। একদিকে যেমন হরদয়াল জার্মানীতে বার্লিন কমিটি প্রতিষ্ঠা করে অর্থ, অস্ত্র, লোকবল সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছেন জার্মান সরকারের সহায়তায়, অন্যদিকে পিংলে গোটা উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম-ভারতে বিপ্লবীদের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছেন। বাঘাযতীনের তত্ত্বাবধানেও অখন্ড বাংলা ও ভারতের পুর্বাঞ্চল জুড়ে চলছে সশস্ত্র বিপ্লবের সুমহান পরিকল্পনা। একদিকে জার্মানিতে বন্দী ভারতীয় সেনাদের নিয়ে, সামরিক শিক্ষাশিবির তৈরি করে প্রবাসী বিপ্লবীরা বিরাট সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে চলেছেন অপরদিকে আরেকজন বিপ্লবী একই সময়ে ভাবছেন পাঞ্জাব-সিন্ধুপ্রদেশ, হয়ে বেনারস বাংলা বর্মামুলুক-সিঙ্গাপুর জুড়ে বিরাট সেনাবিদ্রোহের নিখুঁত ছক। গোটা দেশজুড়ে ব্রিটিশ হুকুমতকে উপড়ে ফেলার ছক। শুরুটা হবে পাঞ্জাব থেকে, কারণ পাঞ্জাবের পরিস্থিতি অনেক পরিণত, বিপ্লবের অনুকূল। 'হিমালয় শিখর থেকে সাগর অবধি' ব্রিটিশসিংহের ঘুম কেড়ে নেওয়া বাঙালি বিপ্লবী রচনা করতে চাইলেন

এক মহাকাব্য। বিপ্লবের মহাকাব্য। তিনি রাসবিহারী বসু।

ঘনিয়ে ওঠা দেশব্যাপী ধুমায়িত অসন্তোষ কাজে লাগাতে চাইলেন রাসবিহারী, সহযোদ্ধা পিংলেকে নিয়ে পাঞ্জাবে রওনা দিলেন ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। গদর বিপ্লবীদের সাথে আলোচনা করে বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু স্থির হল লাহোরে। রাজনৈতিক ডাকাতির মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ, অস্ত্রসংগ্রহ, বোমা তৈরি, রেললাইন-টেলিগ্রাম ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেশব্যাপী ব্রিটিশ শাসককে বিপর্যস্ত করার কর্মসূচী নেওয়া হলো। ব্রিটিশ সেনানিবাসের ভারতীয় সৈনিকদের সাথে গোপনে যোগাযোগ করে দিল্লী, লাহোর, আম্বালা, রাওয়ালপিন্ডি, মিরাট, ফিরোজপুর প্রভৃতি স্থানে সেনাছাউনিতে একই সঙ্গে তীব্র সামরিক অভ্যুত্থানের দিন ঠিক হলো ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫। ক্রমশ যা ছড়িয়ে পড়বে কানপুর, এলাহাবাদ, বেনারস, লোখনৌ, বাংলাদেশ, বর্মা হয়ে সিঙ্গাপুর অবধি। গদর পত্রিকা, ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী সাহিত্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল দেশী সিপাহীদের মধ্যে।

২রা ফেব্রুয়ারী, রাজনৈতিক ডাকাতি করতে গিয়ে অমৃতসরের কাব্বাগ্রামে গুলিতে মারা গেল এক গৃহকর্তা। বিপ্লবী ডাকাতদের ভেতরেই কেউ ছিলো বিশ্বাসঘাতক। পাঞ্জাব পুলিশের কাছে খবর গেল এতো নিছক সাধারণ ডাকাতি নয়। যে ভয়ানক ব্রিটিশবিরোধী ষড়যন্ত্রের বীজ পোঁতা হয়েছে দেশজুড়ে, তারই জন্য অর্থসংগ্রহ চলছে। তটস্থ হয়ে উঠলো পুলিশ। বিশ্বাসঘাতকের কথায় পরে আসা যাবে, সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। গোটা ভারতের বিপ্লবী সমাজের কাছে রাসবিহারীর সহযোগীরা দূত মারফত জানিয়ে দিয়েছেন উত্তর ভারতের শহরে শহরে, সেনানিবাসে একযোগে শুরু হবে সেনাবিদ্রোহ। পাঞ্জাবের সাধারণ গ্রামবাসী থেকে শুরু করে যুগান্তর অনুশীলন সমিতি সকলেই একসাথে অবহিত হয়েছিলো আসন্ন মহাবিদ্রোহের প্রত্যাশায়।

অপ্রচলিত, আগস্ট ২০১৫

মহম্মদ সিং আজাদের বিচার

The King V. Udham Singh কেসের চার্জশীট দাখিল হয় পয়লা এপ্রিল ১৯৪০। লন্ডনের ওল্ড বেইলি সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্টে আসামীর বিচার শুরু হয় ৪ জুন। আসামী নিজের ডিফেন্সে একটি কথাও বলেনি। ১৩ মার্চ মাইকেল। ও ডায়ারকে ক্যাক্সটন হলে যখন গুলি করে হত্যা করেন উধম সিং সেদিনও একইরকম শান্ত ছিলেন তিনি। পুলিশ ও অন্য সাক্ষীরা জানিয়েছে উচ্চপদস্থ এই রাজপুরুষকে হত্যার অনেক সুযাগে তিনি অনেকবার হলের ভেতর পেয়েছেন কিন্তু গুলিটা সেই সময়েই করেছেন যখন হল পরিপূর্ণ। অর্থাৎ আসামী পালানারে কোনও চেষ্টাই করেনি। সে যেন চাইছিল সকলে দেখুক ও জানুক কাকে, কে হত্যা করছে! বাঘা বাঘা সরকারী কর্তা ও অভিজাত গন্যমান্যরা উপস্থিত ছিলেন অকুস্থলে। পুলিশ ২৪ জন সাক্ষী জোগাড় করে। বিচারক অ্যাটকিনসনের আদালতে সরকার পক্ষের আইনজীবি জি.বি. ম্যাকলুর এবং আসামী পক্ষের হয়ে দাঁড়ান তিনজন, সেন্ট জনস হাচিনসন, আর, ই.সিটন এবং ডি.কে, কৃষ্ণমেনন (পরবর্তীতে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী)

চার্জশীটে বলা হয়েছিল Accused was originally charged in the name of Mohammed Singh Azad, any may continued to claim that as his name. Letters found on him show that his passport is in the name of Udham Singh. When the accused was first charged, a good deal of was directed to the prefix Mohamed, and let to considerable misapprehension as to the accused's religion and race. This prefix suggests that the accused is a Mohammedan, but he would appear to be a renegade Sikh.

কৃষ্ণ মেনন আসামীকে দুটি প্রশ্ন করেন, দুটিই ভারতে ব্রিটিশ শাসন সংক এবং সিং দৃঢ়তার সাথে দুটি প্রশ্নের উত্তর দেন। বিচার পরের দিনের ত মুলতুবি হয়।

দ্বিতীয় দিনের শুরুতে প্রসিকিউশন একটি নাতিদীর্ঘ বক্তব্য পেশ করলে তাদের মতে আসামী উধম সিং একজন ঠান্ডা মাথার খুনী। ইতিপূর্বে তার বন্ধ সে একথা স্বীকারও করেছে। ডিকেন্স কউন্সিলের আলাচিত ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই মামলা অর্থহীন ও অপ্রাসঙ্গিক। এরপরে সাক্ষ্যদান ও ক্রস এক্সামিনেশন চলতে থাকে। হত্যার অব্যবহিত পরে উধম সিং মেট্রোপলিটন পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ সায়োইনের কাছে যে জবানবন্দী দেন তা পাঠ করা হয়।

বিচারের শেষ দিন উধম সিং কিছু বক্তব্য রাখার আর্জি জানান। ব্রিক্সটন। জেল কাস্টডিতে দীর্ঘদিন অনশন ও জোর করে খাওয়াবার চেষ্টায় তিনি দুর্বল ও অসুস্থ ছিলেন কিন্তু মানসিক দৃঢ়তা ফুটে বেরোচ্ছিল তাঁর চেহারা থেকে।।

জাস্টিস অ্যাটকিনসন অভিযুক্তকে জানান যে আদালতে তার রাজনৈতিক মতাদর্শ ইত্যাদি নিয়ে আগ্রহী নয়। এই কেস ও অভিযাগে সংক্রান্ত কিছু বক্তব্য। থাকলে আসামী পেশ করতে পারে। এক্ষণে সরকারী উকিল ম্যাকলুর বলেন যে। আসামীর বক্তব্য বাইরে প্রকাশ করা যাবে না

এবং এমার্জেন্সী পওয়ার অ্যাক্ট সেকশন-৬ অনুসারে তা প্রেস বা অন্য কোথাও প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। জজ এবার উধম সিং কে জানান, যে বিষয়টি সর্বসমক্ষে প্রকাশিতই হবে না তা কোর্টরুমে বলে কোনো লাভ আছে কি?

পরোয়া করলেন না বিপ্লবী উধম। তাঁর অবিচলতা লক্ষ্য করে জজ অগত্যা অনুমতি দিলেন। পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করে পড়তে থাকেন। তিনি। তাঁর বক্তব্য ছিল সহজ ও সরল। শাস্তি, মৃত্যুদন্ড বা তার অপরাধের কথা বিন্দুমাত্র প্রতিফলিত হল না সেখানে। তাঁর কাজ ও উদ্দেশ্য ছিল নির্দিষ্ট। এবং তাতে বিন্দুমাত্র অনুতাপ নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে নোংরা কুকুরের সাথে তুলনা করে সিং বলে চললেন 'এমন একটা দিন আসবে যখন ভারত থেকে। ব্রিটিশ শক্তি পালাতে পথ পাবেনা। তিনি জানান সাধারণ ইংরেজ জনসাধারণের ওপর তার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। ইংল্যান্ডে তাঁর সাহেব বন্ধুর সংখ্যা হয়ত স্বদেশের তুলনায় বেশিই। এদেশের শ্রমিক, কর্মচারী মানুষকে আসামী বন্ধুই মনে করেন। তাঁর একমাত্র শত্রু হল পররাজ্যগ্রাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। জজ এবার অধৈর্য হয়ে পড়েন। তিনি জানান উধম সিং এর বক্তব্য শুনতে আদালত আগ্রহী নয়। সিং হেসে জানান কারণ আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন, আমার বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি।

জুরীরা যখন তাকে মৃত্যুদন্ড দিলেন তখনও একই রকম শান্ত ছিলেন সিং। ডানহাত উপরে তুলে তিনবার ইনকিলাব জিন্দাবাদ বললেন মৃত্যপথযাত্রী। বিপ্লবী।

১৩ মার্চ ক্যাক্সটন হলে, ১৪ মার্চ বা স্ট্রীট পুলিশ স্টেশনে এবং আদালতে যে বক্তব্য রেখেছিলেন অকুতাভেয় বিপ্লবী তা প্রকাশ হল পত্রপত্রিকায়, সেন্সরশিপ থাকা সত্ত্বেও। ১৩ জুলাই পেন্টাভিল কারাগারে ফাঁসি হয়ে গেল উধম সিং অথবা মহম্মদ সিং আজাদের।

আজকে যারা দেশপ্রেমের পাঠ শেখায় তাদের পূর্বজরা অর্থাৎ পাঞ্জাব হিন্দু সভা জালিয়নওয়ালাবাগ গণহত্যার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল। যখন। গাটো দেশ ঘৃণায়, ক্রোধে ফেটে পড়ছে তখন তারা নিন্দা তো করেইনি

উল্টে বলেছিল 'ঈশ্বরের অসীম কৃপায় আর্যজাতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যা সুদূর। অতীতে ভাগ হয়ে গেছিল তা আবার এক হতে পেরেছে। এক জাতি অপরটিকে রাজনৈতিক পথনির্দেশ ও সুরক্ষা প্রদান করছে। যে সাম্রাজ্যের সূর্য কখানো অস্ত যায় না তার প্রজা হিসাবে আমরা গর্বিত এবং এই প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা প্রদান করতে সর্বদাই সচেষ্ট।

উধম সিং ওরফে মহম্মদ সিং আজাদ শুধু একটি নাম নয়, গোটা দেশের প্রতিনিধি যারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ সমস্ত তুচ্ছ করে কাঁধে কাধ মিলিয়ে লড়েছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের স্বদেশী দালালদের বিরুদ্ধে।

ISBN 978-81-928741-0-4